যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি
লিখিত ভূমিকা সমেত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্
প্রণীত

কলিকাতা
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩৩৬

মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীপতি প্রেস
৩৮ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ-পত্র

পিতৃদেবের চরণে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গ্রন্থকারের নিবেদন

'গৃহস্থ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন সংখ্যায় 'ক্ষয় ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়' বাহির হয়। এই সময়ে পরলোকগত বন্ধু ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই কাল ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। এই ব্যাধির চিকিৎসা সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে কোন কথা না থাকাতে তিনি 'গৃহস্থে'র কোন এক সংখ্যায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আমি তদনুসারে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'যক্ষ্মারোগে কয়েকটি বিশেষ উপসর্গের সহজ প্রতিকারোপায়' লিখি। সে পত্রিকায় এই বিষয়ে আমার আর কোন প্রবন্ধ বাহির হয় নাই এবং উক্ত দুইটি প্রবন্ধই সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়রূপে প্রকাশিত করিয়াছি। 'গৃহস্থ' পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থাই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় করেন। তাঁহার যত্ন ভিন্ন ইহা প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না।

এই প্রবন্ধ যখন 'গৃহস্থে' প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন উহার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়ে। আমার পরম গৌরবের বিষয় যে, তদানীন্তন সাহিত্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সুদৃষ্টি ইহার উপর পতিত হয়। তিনি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের মধ্যস্থতায় আমার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ

করেন এবং নানাবিধ উৎসাহবাক্য দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করেন। আমি ইহা পরম ভাগ্য বলিয়া মনে করি।

অতঃপর প্রায় ১৪ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি এই বিষয় সম্বন্ধে বহুবিধ চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়াছি। গত ইং ১৯২৭এর জানুয়ারী মাসে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়া হয়। নানারূপ অসুবিধার জন্য গ্রন্থখানি বাহির করিতে দুই বৎসরের অধিক সময় লাগিয়া গেল। মফস্বলে থাকিয়া বই ছাপান বিড়ম্বনাই বটে। যে সব বৈষয়িক কারণে আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়, তাহাদের কবল হইতে এখনও মুক্তি পাই নাই। এতদ্ব্যতীত নিজের ও পারিবারিক অসুস্থতা এবং কাজের বাহুল্যবশতঃ বইখানির প্রকাশে বিলম্ব হইয়া গেল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ উকীল এম, বি, মহাশয় প্রথম দুই ফর্ম্মার প্রুফ দেখিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় সমস্ত প্রুফগুলি দেখিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ও শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয়দ্বয় নানাভাবেই সাহায্য করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম বি মহাশয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।

পুস্তকখানি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়, সে বিষয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলকাম হইয়াছি, জানি না। আমি রোগের নিদান, রোগনির্ণয়-প্রণালী, অন্যান্য রোগ হইতে ইহার পৃথক্‌করণ বা বিস্তৃত চিকিৎসা সম্বন্ধে ইহাতে কোন আলোচনাই করি নাই। চিকিৎসা-প্রণালী, সাধারণ উপসর্গ নিবারণের সহজ উপায়, স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা, ইন্‌জেকৃশন চিকিৎসা, সৌর-চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান ও পথ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই রোগের কারণ কি এবং কিরূপে ইহা নিবারিত হইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। দেশে একটা চলিত কথা আছে,—"যার হয় যক্ষ্মা, তার নাই রক্ষা।" কিন্তু এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। এই রোগ দুরারোগ্য নহে।

প্রথমে প্রবন্ধাকারে বাহির হওয়াতে স্থানে স্থানে পুনরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে। কতক স্থানে উহা ইচ্ছাকৃতও হইয়াছে—যাহাতে বার বার শুনিয়া বিষয়গুলির সহিত সাধারণের বিশেষভাবে পরিচয় হয়। ইচ্ছা সত্ত্বেও বইখানি মনের মত করিতে পারিলাম না। যক্ষ্মা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে বাকী রহিল। যদি শ্রীভগবান্ দিন দেন, তবে ভবিষ্যতে বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইহা দ্বারা যদি রোগ নিবারণে কোন সহায়তা হয় এবং যদি দেশবাসীর দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হয়, তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক বোধ করিব।

আশার কথা এই যে, সম্প্রতি এ বিষয়ে লোকের একটা

জাগরণ দেখা যাইতেছে। ইহারই মধ্যে যাদবপুর স্যানাটোরিয়ামে রোগীর জন্য স্থান-সংখ্যা বাড়ান হইতেছে। সে দিন মাদ্রাজের নিকট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়, ডাক্তার মুথুর তত্ত্বাবধানে একটী স্যানাটোরিয়ামের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। আরও স্যানাটোরিয়াম খুলিবার টাকা উঠিতেছে। পাঞ্জাবে কর্ম্মবীর লালাজী এই জন্য বৃহৎ দান করিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে বিহারেও স্যানাটোরিয়াম খোলা হইয়াছে। নানাবিধ যক্ষ্মা-নিবারণ-সমিতি গঠিত হইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশেও একটী হইয়াছে। ছায়াচিত্র সাহায্যে ও বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা জ্ঞান বিস্তারের প্রয়াস দেখা যাইতেছে। এ সকলই সুলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। প্রার্থনা করি, এই কার্য্যে শ্রীভগবান্ আমাদের সহায় হইবেন।

দু'চারটি ভুল রহিয়া গিয়াছে—পাঠকগণ সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

১লা অগ্রহায়ণ,—১৩৩৬
সন্তোষ। — গ্রন্থকার

বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়—

ব্যাধির ক্রমবৃদ্ধি—প্রকাশিত মৃত্যুতালিকা যথার্থ নহে—যথার্থভাবে লইবার উপায়—সতর্কতার প্রয়োজন—চেষ্টাদ্বারা দূর হইতে পারে—লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক—ক্ষয় কোথায় হয়—ব্যারাম দেখা দিবার সময়কার লক্ষণ—রুদ্রমূর্ত্তি ও গোপনমূর্ত্তি—ব্যাধির মুখ্য কারণ—আক্রমণের প্রণালী—জীবাণুর আবিষ্কার—জীবাণুর স্বরূপ—জীবাণুর প্রকৃতি—মানুষ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ প্রাণীর ক্ষয় হয়—মানুষের ও অপর প্রাণীর কি একই জীবাণু—জীবাণুর প্রবেশ-পথ—পিতামাতা হইতে সন্তানে বর্ত্তে কি না—চর্ম্মপথ—শ্বাস ও আহার্য্যপথ—অন্ননালীপথ—টন্সিলের ব্যবহার—কান—পাকস্থলীতে—অন্ত্রে—মলদ্বারে—পেটের যক্ষ্মা—শ্বাসপথে—শ্বাসপথ ও অন্ননালীপথ সম্বন্ধে বিচার—শিশুদের ক্ষয়ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—ব্যাধিগ্রস্ত মাতার স্তন্যপান সন্তানের উচিত কি না—গোস্তনের ব্যাধি—ব্যাধি নিবারণের উপায়—থুতু—মক্ষিকার কার্য্য—জনসাধারণের শিক্ষা—ব্যাধি সংক্রামক, কিন্তু ছোঁয়াচে নহে—আলোক ও বায়ুর উপকারিতা—মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্য—রান্নাঘরের ব্যবস্থা—গৃহে লোকবাহুল্যের অপকারিতা—আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব—দেশ দরিদ্রপ্রধান—মিউনিসিপ্যালিটির ও ধনীদিগের কর্ত্তব্য—যে সব কাজে ক্ষয়রোগ হওয়ার আশঙ্কা—যে সব রোগ হইতে ক্ষয়ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা—দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা—আধুনিক সভ্যতার ফল—বাল্যবিবাহ ও বিসদৃশ বিবাহ—অবরোধ-প্রথা—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর—ব্যাধি হইলে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন—ইহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় আবশ্যক—বায়ু পরিবর্ত্তন—স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা—লোকশিক্ষা—গবর্ণমেণ্ট—অর্থ—সমিতিগঠন—আশার কথা—আমাদের কর্ত্তব্য—সতর্ক হইবার লক্ষণসমূহ—ডাক্তারদের কথা।

১—৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

যক্ষ্মারোগে কয়েকটী বিশেষ উপসর্গের সহজ প্রতিকারোপায় বা গৃহ-চিকিৎসা—

সাধারণ কথা—প্রবল জ্বরে—জ্বর ত্যাগকালীন অবসাদ—গলা দিয়া রক্ত উঠা—ব্যথা—সর্দ্দী—কাশি—শ্বাসকষ্ট—অনিদ্রা—রাত্রে অতিরিক্ত ঘর্ম—অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা প্রভৃতি—বমন—উদরাময়—কোষ্ঠকাঠিন্য।

৬৫ — ১০৯

তৃতীয় অধ্যায়

ঋতুর গোলযোগ—গর্ভাবস্থা—যক্ষ্মারোগীর বিবাহ করা উচিত কি না—

১১০ — ১১৬

চতুর্থ অধ্যায়

পথ্যাপথ্য—

সাধারণ কথা—দুগ্ধ—মাখনজাতীয় পদার্থ—ডিম—মৎস্য—মাংস—শর্করাজাতীয় জিনিষ—তরিতরকারী—ফলাদি—চা প্রভৃতি—মিঠাই—চাটনী।

১১৭—১৩১

পঞ্চম অধ্যায়

চিকিৎসা-প্রণালী—

টিউবারকিউলিন কাহাকে বলে—টিউবারকিউলিনের প্রয়োজনীয়তা—টিউবারকিউলিন কিরূপে ব্যাধি আরোগ্য করে—যক্ষ্মা নির্ণয়ে—প্রস্তুত প্রণালী—প্রয়োগস্থান—বিপদের আশঙ্কা—কাহাদের উপকার হয়—কত দিন চিকিৎসা প্রয়োজন—কি কি অবস্থায় ইহা বিশেষ কার্য্যকরী। যক্ষ্মারোগে ইন্‌জেক্‌শন চিকিৎসা—সৌরস্নান ও অন্যান্য কৃত্রিম আলোক-চিকিৎসা—কৃত্রিম উপায়ে নিউমো-থোরাক্স দ্বারা যক্ষ্মা-কাশির চিকিৎসা—স্যানাটোরিয়াম—ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়াম—ধরমপুর স্যানাটোরিয়াম—জেনানা মিশন স্যানাটোরিয়াম, আলমোরা—প্যারেল স্যানাটোরিয়াম—মদনপল্লী ইউনিয়ন মিশন স্যানাটোরিয়াম—মিশন স্যানাটোরিয়াম, আজমীর—পেণ্ড্রা মিশন স্যানাটোরিয়াম—হোলকার দরবার স্যানাটোরিয়াম, রাও।

১৩২—১৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

যক্ষ্মা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা—

ক্ষয়বিস্তারের নানাবিধ কারণ—যক্ষ্মা-জীবাণুর জীবনী-শক্তি সম্পর্কে পরীক্ষা—যক্ষ্মা জীবাণুর ধ্বংসের উপায়—যক্ষ্মার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—মুক্ত বায়ুর উপকারিতা—যক্ষ্মা-রোগীর কি কি বিষয় জানিতে পারিলে তাহার চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া যায়—চিকিৎসায় আরোগ্য লাভের পর ক্ষয়রোগীর প্রতি উপদেশ—যক্ষ্মা-রোগীর গৃহ-চিকিৎসা—গৃহ-চিকিৎসার দ্বারা উপকার লাভ নিম্ন-লিখিত বিষয় কয়েকটির উপর নির্ভর করে—

১৬৫—১৮৬

সপ্তম অধ্যায়

শেষ কথা—

যক্ষ্মা-রোগে তাপ, নাড়ীর গতি ও দেহের ওজন—যক্ষ্মা-রোগীর শেষ অবস্থায় চিকিৎসা—যক্ষ্মা-রোগে সুলক্ষণাবলী—যক্ষ্মারোগে কুলক্ষণাবলী—ক্ষয়-রোগে সাধ্যাসাধ্য নির্দ্দেশ—যক্ষ্মাকাশে কি কি ভাবে মৃত্যু ঘটে—রোগী ও ডাক্তার—যক্ষ্মা দূর করিবার উপায়—যক্ষ্মা-রোগে কয়েকটি মনে রাখিবার কথা।

১৮৫—২০৫

চিত্র-সূচী

১।	যক্ষ্মা-রোগে ফুসফুসের বিবিধ অবস্থা	১
২।	যক্ষ্মা-জীবাণু	১৫
৩।	ডেট্‌ভিলারের পকেট ফ্লাস্ক	৩৬
৪।	ডাক্তার রলিয়ারের সৌর-চিকিৎসালয়ের একটি দৃশ্য ...	১৫২
৫।	ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়াম	১৫৯
৬।	ডেভো স্যানাটোরিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ...	১৬৪
৭।	জনাকীর্ণ স্থানে যক্ষ্মা-রোগীর বাসোপযোগী গৃহ ...	১৮২

গুটি বা ক্ষয়ের অবস্থা

গলাভূত অবস্থা

রক্তাধিক্যের অবস্থা

সুস্থ অবস্থা।

ক্ষয় রোগে ফুসফুসের বিভিন্ন অবস্থা।

যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার

প্রথম অধ্যায়

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

আমাদের এই বঙ্গদেশে ক্ষয়রোগ যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে সেকথা বোধ হয়, কাহাকেও যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইতে হইবে না।

ব্যাধির ক্রমবৃদ্ধি

গবর্ণমেণ্টের স্যানিটারী কমিশনার যে রিপোর্ট বাহির করেন, তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ ব্যাধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০৮ সালে এক কলিকাতা সহরেই এই ব্যাধিতে শতকরা ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে; ১৯১২ সালে মৃত্যুর হার শতকরা ১০ জনে উঠিয়াছে এবং উহা ক্রমশঃই বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে। প্রসিদ্ধ অনুসন্ধানকারী প্রথিতযশা স্যর লিওনার্ড রজার্স, কলিকাতাস্থ হাসপাতালসমূহে ২২ বৎসরের মধ্যে যে সকল শব-ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মোট মৃত্যু-সংখ্যার শতকরা ১৭ জনের মৃত্যু এই ব্যাধিতে

ঘটিয়াছে এবং শতকরা ২৫ জনের মধ্যে এই ব্যাধির লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

আমাদের দেশে কাহার কি রোগে মৃত্যু হইল, সে সংবাদ ঠিকভাবে গ্রহণ করা হয় না। পল্লী-গ্রামে চৌকিদারেরাই এই সব খবর সংগ্রহ করে। এই সব গুরুতর কাজ তাহাদের দ্বারা কতটা ভালভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সহরতলীতে অধিকাংশ সময়েই মৃত্যুর কারণ যে যাহা বলে, শ্মশানঘাটে বা গোরস্থানে তাহাই লিখিয়া লওয়া হয়। যাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান আছে ও যাঁহারা ব্যাধি চিনিতে সমর্থ, আমার মনে হয়, এরূপ শিক্ষিত লোক যদি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তবেই সাফল্য লাভের সম্ভাবনা।

প্রকাশিত মৃত্যু-তালিকা যথার্থ নহে

প্রত্যেক জেলায় একজন "হেল্‌থ অফিসার" ও মহকুমায় একজন "স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার" নিযুক্ত হইবার কথা। স্থানে স্থানে হইয়াছে, কিন্তু সকল স্থানে এখনও হয় নাই। ইঁহাদের উপর এই মৃত্যু-তালিকা সংগ্রহের ভার দিলে বেশ চলিতে পারে। এক একটী মহকুমা আয়তনে যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে একজন স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার দ্বারা সমস্ত মহকুমার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য। তথাপি বর্ত্তমানে বাধ্য হইয়া ঐ একজন দ্বারাই আমাদের কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। মহকুমার অন্তর্গত গ্রামগুলি ভাগ করিয়া লইয়া পর্য্যায়ক্রমে

যথার্থভাবে লইবার উপায়

ঐগুলি ঘুরিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে রোজই ১০।২০ জন করিয়া মরে না, আর সংবাদটি ৫।৭ দিন পরে পাইলেও যখন কোনরূপ ক্ষতির কারণ নাই, তখন একটু মনোযোগ করিলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। সদরের হেল্‌থ অফিসার ইঁহাদের উপর তত্ত্বাবধান করিলে কার্য্যটি আরও সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইবার কথা!

ক্ষয়রোগ বহুরূপী। একরূপে না হয়, অন্যরূপে উহাকে প্রতি নিয়তই আমরা দেখিতেছি। যাহারা ব্যাধিতে ভুগিতেছে তাহাদের সংস্পর্শে আমাদের নিত্যই আসিতে হইতেছে; সুতরাং আমরা সহজেই জানিতে পারিতেছি, ক্ষয়রোগ কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী রিপোর্টে যে মৃত্যুর হার দেখা যায়, তাহা হইতে মৃত্যু-সংখ্যা অনেক বেশী বলিয়া আমাদের ধারণা। আমাদের প্রায় এমন দিন যায় না, যে দিন অন্ততঃ ২।১টা ক্ষয়ের রোগী না দেখি। এ শত্রু যদি আমাদের পশ্চাতে এতই লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে কি আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত নহে? ইহা যাহাতে একেবারে নির্ম্মূল হয়, তাহার জন্য কি আমাদের সকলে মিলিয়া বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য নয়?

সতর্কতার প্রয়োজন

ক্ষয় এমন একটা রোগ নহে, যাহার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করিতে পারি না। আমরা একটু সচেষ্ট হইলেই ইহাকে দূর করিতে পারি।

চেষ্টাদ্বারা দূর হইতে পারে

কতকগুলি দেশে ইহা চেষ্টার দ্বারা তাড়িত হইয়াছে। ইংরাজদের দেশে এ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। জার্ম্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত ও সুসভ্য দেশেও ইহাতে মৃত্যু-সংখ্যা খুব কম। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্যই যে এরূপ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। প্রজাদের স্বাস্থ্য সর্ব্বদা যাহাতে ভাল থাকে, তথাকার গবর্ণমেণ্টের সে সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে। ক্ষয় যাহাতে বিস্তৃত না হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা কত উপায়ই না উদ্ভাবন করিতেছেন। আপদ্‌টা যাহাতে একেবারে দূর হইয়া যায়, সে জন্য সকলে মিলিয়া কি চেষ্টাই না করিতেছেন এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় এই দুষ্ট ব্যাধিও অতি দ্রুতগতিতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দেশের জনসাধারণ সহসা কোন নূতন কথা বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত হয় না। পুরাতন সংস্কারও সহজে বর্জ্জন করিতে পারে না। একটা বিষয় উপকারী, কি অপকারী, তাহা না বুঝিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করার দিন আর নাই। লোকের বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে বিষয়টির উপকারিতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। যদি সুফল দেখিতে পায়, তবে আপনা হইতেই তাহারা ইহার প্রতিকার-প্রচেষ্টায় উৎসাহের সহিত যোগদান করিবে। যে সকল উপায় দ্বারা অন্যান্য দেশে ক্ষয়ের হ্রাস প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা যদি সকলকে

সহজভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই সমূহ উপকার হইবে।

আশা করি, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষিত হইবে এবং যাহাতে সর্ব্বসাধারণে এ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বিত হইবে।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক

গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ একযোগে চেষ্টা করিলে আমাদের দেশ হইতে এ ব্যাধি সম্পূর্ণ দূরীকৃত না হইলেও অনেকটা যে কমিয়া যাইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ক্ষয়রোগ দেহের সর্ব্ব স্থানকেই আক্রমণ করিতে পারে—তবে কতক স্থানে অধিক হইতে দেখা যায় ও কতক স্থানে কম হইয়া থাকে।

ক্ষয় কোথায় হয়

পূর্ণবয়স্কগণের মধ্যে ফুসফুসই আক্রান্ত হয় অধিক; আর বালক বালিকাগণের মধ্যে সচরাচর বীচি (Lymph gland), হাড় ও সন্ধিগুলি (Joints) আক্রান্ত হয় বেশী।

(১) গলায়, ঘাড়ে, বগলে, শ্বাসনালী ও ফুসফুসের চারিদিকে, পেটে, কুঁচকিতে এবং অন্যান্য স্থানের বীচিগুলি ক্ষয় দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। অনেক ছেলেমেয়ের গলার চারিদিকে সুপারির মত বীচি বীচি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ফুলাগুলি এই জাতীয়। অনেক সময় উহা আপনা আপনিই পাকিয়া উঠে এবং ফাটিয়া পূঁজ রক্ত বাহির হয়। ইহা সহজে আরোগ্য হয় না—অনেক দিন ভুগিতে হয়।

(২) ফুসফুসের উপরের পর্দ্দার প্রদাহ হইলে প্লুরিসি (Pleurisy) হয়। সময় সময় উহা ক্ষয়জনিত না হইয়াও হইতে পারে। উহা ক্ষয়-দোষ হইতে এত অধিক উৎপন্ন হয় যে, আজকাল প্লুরিসি হইলেই উহার মূলে ক্ষয় আছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়। সেই কারণে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেই ডাক্তারেরা এত সাবধানে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। হয়ত মাত্র দুই দিন বুকে সামান্য একটু বেদনা হইয়া জ্বর হইল, একটু কাশির উৎপাত দেখা গেল এবং অল্পেতেই সমস্ত ভাল হইয়া গেল। তথাপি ডাক্তারেরা বলিয়া বসিলেন,—"একটু প্লুরিসি যখন হইয়াছিল, তখন কিছু দিনের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়, কিছুদিন বলকারক ঔষধ ব্যবহার কর্ত্তব্য। শরীরে পাতলা ফ্লানেলের জামা ব্যবহার করিও, যেন ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে।" অনেক রোগী ত এ সব কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়। মনে করে, ডাক্তারটি অযথা একটা হাঙ্গামা বাধাইতেছে, মশা মারিতে কামান দাগার বন্দোবস্ত হইতেছে। বাস্তবিক তাহা নহে। জাহাজের পাকা কাপ্তেন যেমন আকাশে সামান্য এক টুকরা মেঘ দেখিলেই বুঝিতে পারে, কোন্ মেঘে ঝড় হইবার ভয় এবং বহু পূর্ব্ব হইতেই জাহাজখানাকে ঝড় হইতে নিরাপদ্ করিবার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করে,—বিজ্ঞ চিকিৎসকও তাহাই করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা বহু রোগী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে, যাহারা এ সময়ে সতর্কতা অবলম্বনে আলস্য করে, ভবিষ্যতে তাহাদের অধিকাংশেরই যক্ষ্মা হইতে দেখা যায়। এই জন্যই

তাঁহারা এত করিয়া রোগীকে সাবধান হইতে উপদেশ দেন। বিষয়টি মোটেই উপেক্ষণীয় নহে।

(৩) পেটের ভিতরে চারিদিক্ ঘিরিয়া যে একটি পরদা (Peritoneum) আছে, উহার ক্ষয়জনিত প্রদাহ হয় এবং তাহাকে পেরিটোনাইটিস্ (Peritonites) কহে।

(৪) হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে যে আবরণ আছে, যাহাকে পেরিকার্ডিয়াম্ (Pericardium) বলা হয়,—সময় সময় উহারও ক্ষয়জনিত প্রদাহ হয়। তবে উহা প্লুরা ও পেরিটোনিয়ামের মত অত বেশী আক্রান্ত হয় না। ক্বচিৎ কখনও হইয়া থাকে।

(৫) ফুস্‌ফুস্—আমরা যক্ষ্মা বলিতে সাধারণতঃ ফুসফুসের আক্রমণই বুঝিয়া থাকি। ক্ষয়ে ফুসফুসকে যত অধিক আক্রমণ করে, এত আর কোন যন্ত্রকেই করে না। ইহা ফুসফুসকে বহুবিধ-ভাবে আক্রমণ করে। আক্রমণ কখনও মৃদু, কখনও বা দ্রুত-গতিতে হইয়া থাকে।

(৬) ক্ষয় সময় সময় গলকক্ষ (Pharynx), স্বরযন্ত্র (Larynx) ও শ্বাসনালীকে (Trachea) আক্রমণ করে। গলার ভিতরে টাক্‌রায় (Soft palate), টন্‌সিলে (Tonsil) ও জিহ্বার মূলদেশে অনেক সময়ে ক্ষয়জনিত ক্ষত দেখা যায়। স্বরযন্ত্র ও স্বর-তন্ত্রীকে (Vocal chord) আক্রমণ করিলে অনেক সময় স্বরভঙ্গ হইতে দেখা যায়।

(৭) পাকস্থলীর ক্ষয় খুব কমই দেখা যায়। তবে যখন ফুসফুসকে আক্রমণ করে, তখন পাকস্থলীর কতকগুলি ক্রিয়া-

বৈগুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—খাদ্যে অরুচি, ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া, বমন প্রভৃতি। অন্ত্রে (Intestine) অনেক সময় ক্ষয়জনিত ঘা হয়—অন্ত্রের চতুর্দ্দিকস্থ বীচিসমূহ বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়।

(৮) প্লীহা ও যকৃৎও ক্ষয় দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবে উহা প্রায়ই পরোক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে।

(৯) ক্ষয় মূত্রাশয়, মূত্রনালীকেও আক্রমণ করে।

(১০) পুরুষের অণ্ডকোষ ও স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়, ডিম্বনালী ও ডিম্বকোষকেও ক্ষয় আক্রমণ করে।

(১১) ক্ষয় কর্ত্তৃক হৃৎপিণ্ডের আক্রমণ সহসা দেখা যায় না। কিন্তু সময় সময় ধমনীকে (artery) আক্রমণ করিতে দেখা যায়।

(১২) ইহা মস্তিষ্ক ও অন্যান্য স্নায়ুকেও আক্রমণ করে। অধিকাংশ সময়ে শিশুদের ক্ষয়জনিত মেনিঞ্জাইটিস্ (Meningitis) হয়। এই ব্যাধি হইলে শিশু তাহার মস্তকটী অনবরত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে,—ভুল বকে ও হঠাৎ তীব্র চীৎকার করিয়া উঠে। সঙ্গে জ্বরও থাকে।

(১৩) ক্ষয়জনিত চর্ম্মরোগ হয়।

(১৪) ক্ষয় স্তনকে আক্রমণ করে।

(১৫) সময় সময় ক্ষয় শরীরের সকল যন্ত্রকেই এককালীন আক্রমণ করে—এই অবস্থাকে "জেনারেল মিলিয়ারী টিউবার্কিউলোসিস্" (General miliary tuberculosis) বলে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ক্ষয় বহুরূপী। ইহা কখন্ যে

কোন্ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তাহার স্থিরতা নাই। কখনও প্রবল ঝড়ের বেগে আসিয়া অতি সত্বর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করে, কখনও অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে জীবনী-শক্তির বিনাশ সাধন করে, কখনও বা প্রবল বেগে আরম্ভ হইয়া শেষের দিকে ধীরগতি প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও অতি মৃদু আক্রমণ হইতে হঠাৎ প্রবল বেগ ধারণ করে। সুতরাং ইহাকে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস করা যায় না। ইহা সর্পের ন্যায় খল-স্বভাব ও ভীতিপ্রদ। সুতরাং ইহাকে মোটামুটি দুইটীরূপে ভাগ করা যায়। যথা—(১) রুদ্রমূর্ত্তি—ভীম প্রভঞ্জন-বেগে আসিয়া আক্রমণ। (২) গোপন মূর্ত্তি—চোরের মত ধীরে গোপনে আগমন করিয়া আক্রমণ।

ব্যারাম দেখা দিবার সময়কার লক্ষণ

রুদ্রমূর্ত্তি ও গোপনমূর্ত্তি

রুদ্রমূর্ত্তি—এই রুদ্রমূর্ত্তির এক প্রধান মূর্ত্তি একিউট্ মিলিয়ারী টিউবার্কিউলোসিস্ (Acute miliary tuberculosis)। ইহা শরীরের সমস্ত যন্ত্রকে একযোগে আক্রমণ করে। তখন ইহা নিম্নোক্ত তিনটী বিশেষ আকারে দর্শন দেয়—

(ক) **টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণ লইয়া ঃ**—টাইফয়েড জ্বরে (Typhoid fever) রোগীর যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়, ইহাতেও সেই সকল হয় এবং প্রথম অবস্থায় ইহা টাইফয়েড জ্বর, কি ক্ষয় ব্যাধি, তাহা নির্ণয় করা অতি কষ্টসাধ্য।

(খ) **নিউমোনিয়া জাতীয়**—নিউমোনিয়া (Pneumonia) হইলে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়, ইহাতেও সেইরূপ লক্ষণসকল দৃষ্ট হয়।

(গ) **মেনিঞ্জাইটিসের মূর্ত্তিতে**—মেনিঞ্জাইটিস্ হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ লক্ষণ দেখা যায়।

এই রুদ্রমূর্ত্তির দ্বিতীয় মূর্ত্তি—ইহা যখন ফুস্‌ফুস্‌কে আক্রমণ করে। ইহা ফুস্‌ফুস্‌কে এমন প্রবলভাবে আক্রমণ করে যে, অতি সত্বরেই রোগীর প্রাণনাশ হয়। ইহাকে গ্যালপিং থাইসিস্ (Galloping phthisis) বলে। এমন কি, অনেক সময় চিকিৎসার পর্য্যন্ত অবকাশ হয় না। ইহা প্রধানতঃ নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া (Broncho-pneumonia) স্বরূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম অবস্থায় ইহাকে ক্ষয় বলিয়া প্রায় ধরাই যায় না। যখন দেখা যায়, নিউমোনিয়ার মত ৮।১০ দিনে "ক্রাইসিস্" (Crisis) হইল না, জ্বর ত্যাগ হওয়া দূরে থাকুক, অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে চলিল, জ্বরের গতির কোন নিয়ম নাই,—অনির্দ্দিষ্ট, নাড়ীর চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাইতেছে, রাত্রিতে ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইল, থুতু যাহা পূঁজের মত ছিল, ক্রমশঃ তাহা সবুজ বর্ণ ধারণ করিল এবং শরীর অত্যন্ত দ্রুত ক্ষয় হইতে চলিল, তখন হয়ত বুঝিতে পারা গেল যে, এ সকলই ক্ষয়জনিত। বয়ঃস্থদের অধিকাংশ সময়েই নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয়; শিশুদের প্রায়শঃই ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ার আকারে আক্রমণ

হইয়া থাকে। সময় সময় ৬।৭ দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সাধারণতঃ, ২।৩ সপ্তাহ হইতে এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। ক্বচিৎ কখনও ব্যাধির গতি নিরস্ত হইয়া বহুদিন ভোগ ঘটে। শিশুদের প্রায়ই হাম, হুপিং কাসি (Whooping cough) প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির পর ইহার আক্রমণ হইয়া থাকে।

গোপনমূর্ত্তি—ইহা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়। এক স্থানে আক্রমণ করিয়া পরে হয়ত অপর স্থানে যায়। ইহা এতই অপ্রত্যাশিত আকারে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সতর্ক চিকিৎসকও সব সময়ে ইহাকে চিনিয়া উঠিতে পারেন না।

গোপনমূর্ত্তি

(ক) **লেটেণ্ট টাইপ** (Latent type):—ফুস্ফুসের কোন অংশে বা অপর কোন স্থানে হয়ত ক্ষয় আক্রমণ করিয়াছে; বিশেষ কোন উপসর্গ নাই, কোন দিন হয়ত বুকে একটু বেদনা হইল, কোন দিন হয়ত হাত পা চক্ষু জ্বালা করিল, শরীরটা হয়ত একদিন দুর্ব্বল বোধ হইল, এইরূপ নানারূপ অনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়—এমন গুরুতর নয় যে, ইহার জন্য রোগীর একটা চিন্তা হইতে পারে। কিন্তু কতক দিন এইরূপ চলিতে থাকিয়া হঠাৎ কঠিন কঠিন উপসর্গ প্রকাশিত হয় এবং রোগীকে অত্যন্ত ব্যস্ত করিয়া তুলে। অন্যবিধ ব্যাধির চাপেও ইহা অপ্রকাশ থাকিতে পারে।

(খ) **অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য লইয়া** ঃ—সময় সময় ক্ষুধা মোটেই থাকে না, কখনও বা হজম হয় না, অম্বল দেখা দেয়। হয়ত, যাহা খাওয়া যায়, তাহাই বমন হয়। কখনও বা ইহার সহিত রক্তহীনতা দেখা দেয়। অল্পবয়স্কা যুবতীদের মধ্যেই ইহার অধিক আক্রমণ দেখা যায়।

(গ) **ম্যালেরিয়া জ্বরের আকারে** ঃ—অনেক সময় শীত হইয়া জ্বর আইসে—ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয় এবং সমস্ত অবস্থাই ম্যালেরিয়ার অনুরূপ দেখা যায়। যে সব স্থানে ম্যালেরিয়া আছে, সে সকল স্থানে প্রায়ই ইহাকে ম্যালেরিয়া বলিয়া ভ্রম হয়।

(ঘ) **কালাজ্বরের আকারে** ঃ—প্রথম অবস্থায়—অনেক সময় কালাজ্বর বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে।

(ঙ) **প্লুরিসি-রূপে** দেখা দেয়

(চ) **স্বরভঙ্গ হইয়া** আরম্ভ হয়।

(ছ) **গলা দিয়া রক্ত উঠিয়া** আরম্ভ হয়।

(জ) **গলার চারিদিকে ও বগলের বীচি বড় হইয়া** আরম্ভ হয়।

(ঝ) **ব্রঙ্কাইটীস্ রূপে** আরম্ভ হয়।

(ঞ) সময় সময় **টাইফয়েডের প্রথম অবস্থার সহিত** গোলযোগ হয়।

(ট) ক্বচিৎ **হাঁপানারূপে** (Asthma) ইহার সূত্রপাত হয়।

ক্ষয়-জীবাণু হইতে ক্ষয় ব্যাধি হয়। ক্ষয়-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলেই যে ক্ষয় ব্যাধিতে আক্রমণ করিবে, তাহা নহে।

ব্যাধির মুখ্য কারণ

শরীরেও এমন একটা অবস্থা হওয়া চাই, যাহাতে ক্ষয়-জীবাণু দেহে প্রবেশ করিয়া তথায় হুকুমজারী করিতে পারে। শরীর সবল ও সুস্থ থাকিলে জীবাণু প্রবেশ করিয়াও বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে না। শরীর লৌহ-নির্ম্মিত নহে। দেহ থাকিলেই উহার ভাল মন্দ আছে। শরীর যদি কোন কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবেই ক্ষয়-জীবাণু উহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রাণিমাত্রেরই আত্মরক্ষার একটা স্বভাবদত্ত ক্ষমতা আছে। একটা বিড়াল বা কুকুরকে প্রহার করিতে গেলে, সেও তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে—আক্রমণকারীকেও পাল্টা আক্রমণ করে। প্রহারকারী যদি উহার সঙ্গে না পারে, তবে উহার জীবন রক্ষা হইল, আর প্রহারকারী যদি অধিক বলবান্ হয়, তবে বিড়াল বা কুকুরের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ও জীবন নাশের সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু প্রাণ থাকুক আর নাই থাকুক, অধিকাংশ সময়ই উহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হয় না। এই লড়াই করিবার শক্তি যে শুধু উহাদেরই আছে, তাহা নহে—আমাদেরও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কুকুরে আক্রমণ করিলে আমরা প্রাণরক্ষার্থ রীতিমত যুদ্ধ করি। এই সব চাক্ষুষ শত্রুর হাত হইতে আমরা যেমন বাঁচিবার চেষ্টা করি, আমাদের দেহও সেইরূপ অতীন্দ্রিয় আগন্তুক শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে চায়। ক্ষয়ব্যাধিও অন্যান্য

অনেক রোগের মতই সাধারণ দৃষ্টির অগোচর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু (Microbe) দ্বারা উৎপাদিত হয়। আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল জীবাণু দেখিতে সমর্থ হই।

ইহারা যখন আমাদিগের দেহকে আক্রমণ করে, তখন দেহও নিশ্চিন্ত থাকে না। আমাদের দেহেরও স্বভাবদত্ত রক্ষণ-ক্ষমতা আছে। দেহস্থ গোরা সৈন্যেরা (শ্বেত রক্ত-কণিকাসমূহ (Leucocytes) সর্ব্বদাই পাহারা দিতেছে—কোনও শত্রু ঢুকিলেই ইহারা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে।

আক্রমণের প্রণালী

দেহের সুস্থ অবস্থায় উহারা বেশ সবল ও সচল থাকে। তখন শত্রুরা আক্রমণ করিলে, তাহাদিগকে প্রায়ই পরাস্ত হইতে হয়। কিন্তু শরীর যদি কোন কারণে অসুস্থ হয়, তবে উহারা হীনবল ও কতকটা অচল হয়। তখন বহিঃশত্রুর সহিত উহারা পারিয়া উঠে না এবং তাহাদের নিকট সহজেই পরাস্ত হয়। বাহিরের শত্রুর সংখ্যা ও বলের উপরেও এ বিষয়ে অনেকটা নির্ভর করে। দুই দশটায় আক্রমণ করিলেই যে আমাদের দেহের কিছু করিতে পারে, তাহা নহে; অনেক শত্রু পিছনে লাগিলে তবে যদি কিছু করিতে পারে। আবার সকল শত্রুই সমান বলশালী নহে। কতক নির্জীব, কতক বা দুর্দ্দান্ত। সুতরাং শত্রুর সংখ্যা ও বল অনুসারেই আক্রমণের তারতম্য ঘটে। কাজেই ক্ষয়-জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলেই আমাদের ক্ষয়রোগ হয় না। কত ক্ষয় জীবাণুই ত শরীরে অনবরত প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু আমাদের

দেহের পাহারাওয়ালারাও সতর্ক। শত্রু ঢুকিতে না ঢুকিতেই তাড়া করিতেছে এবং সুবিধা পাইলেই ধ্বংস সাধন করিতেছে। শরীর যদি কোন ক্রমে ভাঙ্গিয়া যায়, শরীরের স্বাভাবিক বল যদি ক্ষয় হয়, তবে পাহারাওয়ালারাও নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়ে। তখন তাহাদেরও আর শত্রু দমনের শক্তি থাকে না। শত্রুও দেহে প্রবেশের সুযোগ পায়। তখনও অল্প সংখ্যায় আসিয়া কিছু করিতে পারে না। যদি অনেকগুলি আইসে, তবেই সুবিধা করিতে পারে। আর ইহারা যদি দুর্দ্দান্ত স্বভাবসম্পন্ন(Virulent) হয়, তবে অল্পসংখ্যক হইলেও সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বেশীক্ষণ লাগে না।

জীবাণুর আবিষ্কার

জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রবার্ট কথ্ (Robert Koch) সাহেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্ষয়-জীবাণু আবিষ্কার করেন এবং তিনিই প্রথমে দেখান যে, ক্ষয়-জীবাণু হইতেই ক্ষয় ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

জীবাণুর স্বরূপ

ক্ষয়-জীবাণুর আকৃতি সরু কাঠির ন্যায় (Rod-shaped)। সচরাচর সোজাভাবে আসে, সময় সময় অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতিরূপেও (Curved) দেখা যায়। কতকগুলির গায়ে গোটা গোটা দেখা যায় (Beaded appearance)। কখনও বা অনেকগুলি জীবাণু একত্রে পুঞ্জীভূত হইয়াও থাকে। ইহারা অন্যান্য কতকগুলি জীবাণুর মত নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় না, স্থিরভাবে থাকে। এই জীবাণু এক ইঞ্চির (Inch) ১/১২৫০০ হইতে ১/৬০০০ ভাগ লম্বা এবং প্রস্থে এক ইঞ্চির

$\frac{১}{১৪০০০}$ হইতে $\frac{১}{৫০০০০}$ ভাগ হইবে। মানব-শরীরে রক্তের মধ্যে যে লোহিত রক্ত-কণিকা আছে এবং যাহা এক কিউবিক্ মিলিমিটার (Cubic millimetre) স্থানের মধ্যে ৫০,০০০০০ লক্ষ থাকে, ইহা তাহারও প্রায় একচতুর্থাংশ; অর্থাৎ একটী পিন (Pin) কর্ত্তৃক কৃত ছিদ্রের মধ্যে যে স্থান, তাহার ভিতর দিয়া ১০০০ টিউবার্কল্ জীবাণু পাশাপাশিভাবে যাইতে পারে।

ক্ষয়-জীবাণুগুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইলেও অতি কঠিন প্রাণ,—সহজে মরিতে জানে না। এই জীবাণু উদ্ভিদ-জাতীয়। শরীরের বাহিরেও উহারা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। সূর্য্যের প্রখর আলোকে উহারা নিস্তেজ হয়; এমন কি, অধিকক্ষণ থাকিলেই মারা পড়ে। আঁধারে ইহাদের বৃদ্ধি। ভূত প্রেত যেমন অন্ধকারে যমদূতের মত চলিয়া বেড়ায়, ইহারাও সেইরূপ অন্ধকারেই আনন্দ পায়। অন্ধকারে ইহারা অনেক দিন বাঁচিয়াও থাকিতে পারে। ঠাণ্ডাতেও সহজে উহাদের কিছু করিতে পারে না; এমন কি, বরফের ভিতরেও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। বেশী উত্তাপে কিন্তু উহারা অধিক সময় বাঁচে না। ক্ষয়রোগী থুতু ফেলিবার সময়ে কেহ নিকটে থাকিলে উহার সূক্ষ্ম বিন্দুগুলি তাহার দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্ষয় উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু পরিত্যক্ত থুতুও ব্যর্থ হয় না। শুকাইবার পর আপদ্ যাওয়া দূরে থাকুক, ভয়ের কারণ আরও বৃদ্ধি পায়। থুতু শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষয়-জীবাণুগুলি মরে না, বরং ধূলি বালুকণা প্রভৃতিতে ঢাকা

জীবাণুর প্রকৃতি

পড়িয়া বেশ সুখে বাস করে ও দীর্ঘকালেও ইহাদের কিছু হয় না। ২।৪ মাস ত বাঁচেই, এমন কি, ৮।১০ মাসও স্বচ্ছন্দে বাঁচিতে পারে। শুকাইয়া ধূলির সহিত মিশিয়া বায়ু-সংযোগে নানা স্থানে নীত হয়। এইরূপ বায়ুচালিত অবস্থায় শ্বাসের সহিত হয়ত আমাদের ফুস্‌ফুসে আসিয়া উপস্থিত হয়।—দেওয়ালের ফাটালে, গালিচার নীচে বা ঘরে যে সব আসবাব-পত্র আছে, তাহার পিছনে যে-কোন স্থানে একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পাইলেই, একটু চোখের আড়ালে থাকিতে পারিলেই, বেশ স্বচ্ছন্দচিত্তে ইহারা বাস করিতে থাকে।

মানুষ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ প্রাণীর ক্ষয় রোগ হয় ?

ক্ষয় যে কেবল মানুষেরই হয়, এমন নয়। শূকর, গরু, ঘোড়া, মোরগ, খরগোশ, গিনিপিগ্ (Guinea-pig), বানর ও টীয়াপাখী প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুদেরও এই রোগ হইয়া থাকে। বনে, জঙ্গলে, খোলা জায়গায় যাহাদের থাকা স্বভাব, তাহাদিগকে বাটীর ভিতর আনিয়া আবদ্ধ করিলে, প্রায়ই তাহাদের ক্ষয়রোগ হয়। কতকগুলি জন্তুর কিন্তু সহজে এই রোগ হয় না। ভেড়া ও ছাগলের ক্ষয় খুবই কম হয়, আবার গরু, শূকর, মুরগী ও বানরের খুব বেশী হয়। ইংলণ্ডে ত প্রায় শতকরা ৭০টী গরুরই ক্ষয় রোগ দেখা যায়। ভারতবর্ষের গরুর এ রোগ বড় একটা হয় না। মাছেরও যে এই ব্যাধি একেবারে না হয়, তাহা নহে, তবে খুবই কম হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই যে সব কথার আলোচনা করিয়াছি, তাহ হইতে দেখিতে পাই যে, ক্ষয়রোগ মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে

মানুষের ও অপর প্রাণীর কি একই জীবাণু ?

হয় এবং ক্ষয়-জীবাণুই উহার মুখ্য কারণ। একই জাতীয় জীবাণু দ্বারা উভয়ের এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় কিংবা বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা হয়, এ কথা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

এসব লইয়া এত বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে যে, কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। আজ যাহা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতেছে, পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে হয়ত তাহা একেবারে উল্টাইয়া গেল। যাহা ভুল বলিয়া ত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহাই হয়ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইল। এ বিষয়ে একাধিক মত আছে; সুতরাং যাহা অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, আমরা সেই পন্থারই অনুসরণ করিব। মনুষ্যের ও গরুর ক্ষয়-জীবাণুতে আকৃতিগত কিছু পার্থক্য আছে।

মতের অনৈক্যতা।

ভিন্ন জীবে বিভিন্ন অবস্থায় বাসহেতু অথবা অন্য কোন কারণে এই পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা বলা কঠিন। সাধারণতঃ একজাতীয় জীবাণু অন্য জাতীয় প্রাণীর ব্যাধি সৃষ্টি করে না। কখনও যে করে না, তাহা নয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, অবস্থা-বিশেষে উহা সম্ভবপর। এই সব পরীক্ষার ফলও সব সময়ে অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, যখন ক্ষয় রোগ হয়, তখন শরীরের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে না। সুতরাং সুস্থ দেহের উপর যে সব পরীক্ষা হয়, তাহা ঠিক একই ভাবে হয় কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। যতটা সম্ভব, একই

ভাবে পরীক্ষা করিবার যথোচিত চেষ্টা করা হয় সত্য। কখ্ সাহেব মনে করেন যে, গরু ও মানুষের ক্ষয়-জীবাণু পৃথক্ এবং একের দ্বারা অন্যের উদ্ভব সম্ভব নহে। কিন্তু আরলোয়াঁ (Arloing), র‍্যাভেনল (Ravenel) প্রভৃতি মনীষিগণ সেরূপ মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, সব জীবাণুই একজাতীয়, কেবল বিভিন্ন জীবে বাস-হেতু এবং উহাদের স্বভাব ও রীতিনীতির পার্থক্যের দরুন আকৃতিগত সামান্য কিঞ্চিৎ পৃথকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ পণ্ডিত-মণ্ডলীই শেষোক্ত মতের পোষকতা করেন।

এই গরু ও মানুষের ক্ষয়-জীবাণুর সঙ্গেই আমরা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। ইহাদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে জানিতে হইলে আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। আমরা ক্রমে ক্রমে এ সব কথার বিচার করিব এবং একের সহিত অপরের কি সম্বন্ধ, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

জীবাণুর প্রবেশ-পথ।

ক্ষয়-জীবাণু মানুষকে নানাদিক্ দিয়া আক্রমণ করে এবং নিম্নলিখিত পথসমূহে দেহে প্রবেশ করে ঃ—

(১) ইহা শ্বাসের সহিত শ্বাসনালী দিয়া প্রবেশ করিতে পারে।

(২) আহার্য্যের সহিত অন্ননালী দিয়া যাইতে পারে।

(৩) চামড়ার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে পারে।

(৪) গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রবেশ করিতে পারে।

আমরা শেষের পথটি সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করিব।

পিতামাতা হইতে ক্ষয় পুত্রকন্যায় বর্ত্তিতে পারে কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য। এ বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয় ও বহু বাদানুবাদ চলিতেছে। অনেকে মনে করেন যে, পিতামাতা হইতে ইহা ভ্রূণে প্রবেশ করে না। তাঁহারা বলেন যে, পৈতৃক কারণে সন্তানের শরীর দুর্ব্বল ও ভঙ্গুর হয় এবং উহাদের সজীবতার অল্পতাবশতঃই ক্ষয় সহজে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। এ কথা আংশিক সত্য হইলেও প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যেহেতু, অনেক সময়েই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই জরায়ুস্থিত ভ্রূণে ক্ষয় প্রকাশ হইতে দেখা যায়। কাজেই এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পিতামাতা হইতে উহা সন্তানে বর্ত্তিতে পারে। তবে পিতামাতার মধ্যে কাহারও থাকিলেই যে সন্তানের এই ব্যাধি অবশ্যই হইবে, তাহা নহে। এই সংক্রমণ অন্যান্য অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সন্তানোৎপাদনের সময়ে পিতামাতার শারীরিক অবস্থা, মানসিক অবস্থা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ভ্রূণের উপর ক্রিয়া করে। পাঁচটী সন্তানের মধ্যে তিনটীর ক্ষয় হয়, দুইটীর বা হয় না কেন? কখনও সকলটীরই হয়, কখনও একজনেরও হয় না। এ কথার সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে পৃথক্ একটী প্রবন্ধের প্রয়োজন। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং এ বিষয়ে সম্যক্ অনুসন্ধানও হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষয় যে পিতামাতা হইতে সন্তানে বর্ত্তে, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। মেণ্ডেলের নিয়ম (Mendel's Law) এ সব সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে কি

পিতামাতা হইতে সন্তানে বর্ত্তে কি না?

না, তাহাও জানা নাই। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এদিকে পড়িলে এই জাতীয় অনেক বিষয়েই নূতন আলোক-সম্পাত হইতে পারে।

ক্ষয় রোগ দ্বারা চামড়া যে আক্রান্ত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। উহার ভিতর দিয়া ক্ষয়-জীবাণু প্রবেশ করিয়া অন্য স্থানের ক্ষয় জন্মাইতে পারে কি না, তাহাই জানিবার বিষয়।

চর্ম্মপথ।

যদি কোনরূপে কোন স্থানের চামড়া উঠিয়া যায় বা কোন স্থান কাটিয়া যায় এবং ঐ সকল স্থানের সহিত ক্ষয়-জীবাণুর যোগাযোগ হয়, তবে ঐ সব স্থানের ক্ষয় হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। কসাইখানায় (slaughter-house) বা মড়া-কাটা ঘরে (Post-mortem room) ক্ষয়গ্রস্ত প্রাণীর বিস্তর আমদানী হয়।

অসাবধানতাবশতঃ কাটা আঙ্গুল লইয়া কাজ করিতে যাইয়া অনেকেরই ঐ সব স্থানে ক্ষয়রোগ হয়। সময়ে আঙ্গুল ছাড়াইয়া হাত পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে, এমন কি, বগল পর্য্যন্ত ফুলিতেও দেখা যায়। বিশেষতঃ ঐ সব স্থানের বীচিগুলি বড় হয়। বিষ তীব্র হইলে আরও ছড়াইয়া যাইতে পারে। কসাইখানার এক জন লোকের হঠাৎ আঘাত লাগিয়া তাহার একটা আঙ্গুল কাটিয়া যায়। কোনরূপ গ্রাহ্য না করিয়া ঐ কাটা আঙ্গুল লইয়া সে ক্ষয়াক্রান্ত একটা গরুর চামড়া ছাড়ায়। পরদিন দেখা গেল, তাহার সারা হাতটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই বগল অবধি ফুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দেখা

দিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ক্ষয়বীজের দরুন এরূপ হইয়াছে। এরূপ উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং চর্ম্মপথে ক্ষয়বীজের প্রবেশ অসম্ভব নহে। তবে উহারা সাধারণতঃ এ রাস্তায় বড় একটা বেশী দূর অগ্রসর হয় না, এবং গুরুতর কোন অনর্থ ঘটায় না।

ক্ষয়বীজ সচরাচর নিশ্বাসের ও খাদ্যের সঙ্গেই শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। এক্ষণে কোন্‌টির সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ, তাহা দেখা দরকার। এ সম্বন্ধেও অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। পূর্ব্বে মনে করা হইত, শত্রুব্যূহ প্রবেশ করে শ্বাসপথে। আজকাল আবার অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, খাদ্যপথই উহাদের বিশেষ প্রিয়। বিষয়টি গুরুতর। শত্রুকে আমরা শ্বাসের সহিত টানিয়া লই, কি খাবারের সঙ্গে পেটে পুরিয়া ফেলি, সে বিষয়ে একটু চিন্তা করা উচিত। এক একটি ধরিয়া দেখা যাউক—কোন্ পথে কোন্ কোন্ অবধি যায়।

শ্বাস ও আহারপথ

মুখের ভিতর উহারা বড় একটা উৎপাত করে না, মুখে ক্বচিৎ ক্ষয়জাতীয় ঘা হয়। তবে জিহ্বার পিছন দিক্‌টায় অনেক সময় গোটা গোটা হয় ও ঘা হয়। জীবাণু গলার ভিতর দিয়া প্রায়ই বিনা উৎপাতে চলিয়া যায়। যদ্যপি গলার মধ্যে কোনরূপ ঘা থাকে বা সেখানকার পর্দ্দাটায় (mucous membrane) কোনরূপ ক্ষত থাকে, তবে তথাকার ক্ষয় হইতে পারে।

অন্ননালীপথে

কেহ হাঁ করিলে জিহ্বার মূলদেশে গলার দুই পাশে দুইটা সুপারির মত জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগকে টন্সিল বলে। ইহাদের কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, আজ কালও যে খুব কিছু একটা জানা গিয়াছে, তাহাও নয়। উহারা দেহদুর্গের দ্বারপালের কাজ করে। বহু গোরা পল্টন (শ্বেত রক্ত-কণিকা) এই স্থানে বাস করে এবং কোন শত্রু প্রবেশের উদ্যোগ করিলেই তাহাকে বাধা দেয়।

টন্সিলের ব্যবহার

সময় সময় কিন্তু শত্রুগণ এই স্থানগুলি বে-দখল করিয়া বসে এবং এখান হইতে দেহের বহু অনিষ্ট সাধন করে। ক্ষয়-জীবাণুর ইহা একটি বিশেষ প্রিয় বাসভূমি। ক্ষয়াক্রান্ত হইয়া ইহাদের ব্যাধি ত হয়ই, উপরন্তু জীবাণুগুলি এখান হইতে নানা স্থানে যাইয়া ব্যাধি উৎপাদন করে। গলার চারিপাশের বীচিগুলি (cervical glands) প্রায়শঃই এখান হইতে আক্রান্ত হয়। উহারা সাধারণতঃ গলার চতুষ্পার্শ্বেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখান হইতে ফুস্‌ফুসে বা অন্যত্র যাওয়াও কিন্তু কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ক্ষয়বীজ যদিও ইহাদিগকে সময় সময় মুখ্যভাবে আক্রমণ করে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ফুস্‌ফুস্‌কে বা অপর কোথাও মুখ্যভাবে (primarily) আক্রমণ করিয়া তৎপশ্চাৎ ইহাদিগকে গৌণ-ভাবে (secondarily) আক্রমণ করে।

কখন কখন এই জীবাণু গলার ভিতর দিয়া কানে চলিয়া যায়। গলা হইতে কান পর্য্যন্ত দুই পাশে দুইটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে

কান।

(Eustachian tube)। কানে ক্ষয় রোগ হইলে পূঁজ প্রভৃতি হইয়া অনেক ভুগিতে হয়। আবার এই কান হইতে যাইয়া ইহা মস্তিষ্কও (Brain) আক্রমণ করিতে পারে।

জীবাণু গলা হইতে অন্ননালী দিয়া পাকস্থলীতে পৌঁছে। অন্ননালী দিয়া যাইবার সময় এত তাড়াতাড়ি যায় যে, জীবাণুগুলি সেখানে বিশ্রাম করিবার বড় একটা অবসর পায় না, কাজেই অন্ননালীর এই রোগ হইবার আশঙ্কাটা প্রায়ই কাটিয়া যায়।

পাকস্থলীতে

পাকস্থলীর ভিতর অম্ল রস থাকার দরুন ঐ রসে ক্ষয়জীবাণু বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সুতরাং পাকস্থলীরও বড় একটা ক্ষয়রোগ হইতে দেখা যায় না। কিন্তু কোন কারণে যদি পাকস্থলীর অম্লতা না থাকে বা পাকস্থলীর অন্যবিধ পরিবর্ত্তন হয়, তবে এ ব্যাধি হওয়া অসম্ভব নয়।

হয়ত ক্ষয়-জীবাণু পাকস্থলীর ভিতরে কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত হইয়া বা অন্য কোন প্রকারে অম্লরসের সংস্পর্শে না আসিয়াও নিরাপদে আঁতে যাইবার সুযোগ পাইল।

অন্ত্রে

এখানে ভিতরকার রস ক্ষারজাতীয়, সুতরাং ক্ষয়-জীবাণুর বৃদ্ধির একান্ত পরিপোষক; তাই আমরা অন্ত্রের মধ্যে ক্ষয়জাত ঘা অতি বিশদরূপে দেখিতে পাই। এখান হইতে সময় সময় ইহা উদরবেষ্টন-ঝিল্লীকে আক্রমণ করে এবং পেরিটোনাইটিস্ উৎপন্ন করে।

অন্ত্রের সংলগ্ন যে সব বীচি (Lymphatic glands) আছে,

অধিকাংশ সময়ই উহারা আক্রান্ত হয় এবং তথা হইতে রসবাহী নাড়ী (Lymphatic vessels) সহযোগে বুকের ভিতরকার বীচিসমূহ আক্রমণ করে ও পরে ফুস্‌ফুস্‌স্থিত ব্রঙ্ক্‌ইয়াল গ্ল্যাণ্ডগুলি (Bronchial glands) সংক্রামিত হয় এবং সেখান হইতে ফুস্‌ফুস্‌কে আক্রমণ করিয়া যক্ষ্মা সৃষ্টি করে।

মলদ্বারে

আঁতের ভিতরকার ঘা দ্বারা আঁত কুঞ্চিত হইয়া সময় সময় মলদ্বার বন্ধ হয়। (Intestinal obstruction)। কখনও বা বীচিগুলি বড় হইয়া দ্বার বন্ধ বা সঙ্কুচিত করে (Tumour and Stricture) এবং নানারূপ যাতনার কারণ হয়। মলদ্বারে অনেক সময় ক্ষয়জাত ফোড়া ও ভগন্দর হয়।

পেটের যক্ষ্মা

চিকিৎসকগণ অনেক সময়েই পেটে যক্ষ্মা হইয়াছে বলিয়া থাকেন। কথাটি সাধারণে প্রায়ই বুঝিতে পারে না, সুতরাং এ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর আলোচনা প্রয়োজন।

পেটের ভিতরে আঁতে ক্ষয় ব্যাধি যে হয়, এ কথা একটু আগেই বলিয়াছি। এখান হইতে ক্রমে চতুষ্পার্শ্বস্থ বীচিগুলি আক্রান্ত হয় ও পরে পেরিটোনাইটিস্‌-এর সৃষ্টি করে। অধিকাংশ সময়ই জ্বর হইয়া থাকে, তবে সকল সময়ে নয়। বাহ্যের বিশেষ গোলযোগ হয়। কতকদিন হয় ত কোষ্ঠকাঠিন্য হইল, আবার কতকদিন উদরাময় চলিল। এই প্রকার একবার শক্ত মল ও পরক্ষণে পেটের অসুখ বিশেষ সন্দেহের কারণ। সঙ্গে সঙ্গে

আহারে রুচি থাকে না, খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় না ; সময় সময় বা বমন হয়। দেহের বল ক্ষয় হইতে থাকে ও শরীর শুকাইয়া যায়। কিছুদিন এইরূপ চলিলে পেটে জল জমা অসম্ভব নহে। পেটটি বেশ টল্‌টলে হয়, উপরিভাগ মসৃণ ও শিরাগুলি বেশ প্রকাশমান হয়। পেটের ভিতরে বীচিগুলি ফুলার দরুন উপর হইতে হাত দিয়া চাপ দিলে ডিম ডিম বোধ হয়। এই ব্যাধি শিশুদেরই বেশী হয় এবং ইহাকেই পেটে যক্ষ্মা বলিয়া থাকে। (Tabes mesenterica).

যক্ষ্মা শব্দ মাত্র ফুস্‌ফুসের ক্ষয় ব্যাধি সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। তবে উহা দ্বারা পেটের ক্ষয় সহজে ধারণা হইবে বলিয়াই ব্যবহৃত হয়, নতুবা যক্ষ্মা নাম দেওয়া সঙ্গত নয়।

এদিকে জীবাণু শ্বাসপথে নাকের ভিতর ঢুকিয়া কোন্ দিকে যায়, তাহা দেখিতে হইবে। নাকের ভিতর আক্রমণ খুব কমই হয়।

শ্বাসপথে

কণ্ঠনালীর প্রবেশদ্বারের (Larynx) ক্ষয় প্রায়ই দেখা যায়। রোগীর স্বরভঙ্গ হইতে পারে ও আহারে কষ্ট হইতে পারে। এমন স্বরভঙ্গ হইতে পারে যে, কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না। আহার বন্ধ হইয়া যাইতে পারে এবং তদানুষঙ্গিক দেহক্ষয় হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারে। কণ্ঠনালী পথে (Bronchial tube- -Trachea) ক্ষয়বীজ সোজা ফুস্‌ফুসে চলিয়া যায়। কণ্ঠনালীর ভিতরে সিলিয়েটেড্ এপিথি-লিয়ামের (Ciliated epithelium) আবরণ থাকায় ক্ষয়-জীবাণু এ পথে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রবেশ করিতে গেলেই

ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়। কথা এই যে, বাহিরের কোন জিনিষ প্রবেশ করিতেই এই সব স্থানের সুড়সুড়ি হইয়া কাসি আরম্ভ হয় এবং যাহা কিছু ভিতরে যাইবার যোগাড় করিয়াছিল, তাহা বাহির হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু সিলিয়াগুলি সব সময়ে কর্ম্মক্ষম নাও থাকিতে পারে; তখন ত আর উপায় থাকে না; সে অবস্থায় ক্ষয়বীজ অবাধে ফুস্‌ফুসে চলিয়া যায় ও যক্ষা ব্যাধির সূত্রপাত করে।

শ্বাসপথ ও অন্ননালী-পথ সম্বন্ধে বিচার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্বাসপথে প্রবেশের মতকে অনেকেই অস্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন যে, এ পথে ক্ষয়বীজ ফুস্‌ফুসে যায় না। উহা পেটের ভিতরকার অন্ত্র হইতে চতুঃপার্শ্বস্থ বিচিগুলিকে আক্রমণ করে ও তথা হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হইয়া ফুস্‌ফুসের নিকটস্থ বীচিগুলিকে আক্রমণ করে এবং অবশেষে ফুস্‌ফুস্‌কেই ধরিয়া বসে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে,—

(১) অন্ত্রের ভিতর যে সব ক্ষয়বীজ দেখা যায়, তাহা প্রায়ই গোজাতীয়, কিন্তু ফুস্‌ফুসের ভিতর মাত্র মনুষ্যজাতীয় জীবাণুই দেখা যায়।

(২) যক্ষার সকল অবস্থায়ই অন্ত্রের ভিতর ঘা বা তথাকার বীচিগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায় না।

(৩) আমাদের এই ভারতবর্ষে এমন হাজার হাজার লোক আছে, যাহারা কোন জন্মে মাংস খায় না এবং দুধও যে একটু

আধটু খাইবে, অদৃষ্টবৈগুণ্যে দারিদ্র্যবশতঃ সে সুখ হইতেও বঞ্চিত। কিন্তু তাহাদের অনেকের মধ্যেও যক্ষ্মা রোগ দেখা যায়।

প্রথম মতের অনুকূলে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, দেহে প্রবেশ করিবার সময় গোজাতীয় জীবাণুই প্রবেশ করে, কিন্তু দীর্ঘকাল শরীরের ভিতরে থাকার দরুন এবং উহার চারিদিক্‌কার অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য উহা আস্তে আস্তে মনুষ্যজাতীয় জীবাণুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ নিশ্চিতরূপে ঘটিতে দেখিয়াছেন, কেহ এমন কথা বলেন নাই। যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান না হয় এবং বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ না হয়, সে পর্য্যন্ত এই মতের পোষকতা করা যায় না।

দ্বিতীয় মতের স্বপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ক্ষত হয়ত অতি যৎসামান্য হইয়াছিল, এবং উহা এমন ভাবে সারিয়া গিয়াছে যে, উহার চিহ্নমাত্র নাই। বাঁচির ভিতর দিয়াও জীবাণুগুলি এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছে যে, উহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। কিন্তু ইহাও সকল সময়ে সম্ভব নয়।

তৃতীয় মত ইহার একান্তই বিপক্ষে। সুতরাং আমরা যে সব প্রমাণ পাইতেছি, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ক্ষয়-বীজাণু সাধারণতঃ সোজা শ্বাসপথেই যায় এবং মনুষ্যজাতীয় জীবাণুদ্বারাই যক্ষ্মা উৎপাদিত হয়। কিন্তু আমাদের এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কতক কতক জীবাণু খাদ্যপথে দেহে প্রবেশ করে এবং সম্ভবতঃ অবস্থাবিশেষে সময় সময় গোজাতীয় জীবাণু দ্বারাও এই ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

আমরা শিশুদের কথা যখন বলিতেছিলাম, তখন খুব একটা দরকারী কথা বলিতে ভুল হইয়াছিল। ইউরোপে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিশুদের দুধ খাওয়া হইতেই ক্ষয়ের উৎপত্তি এবং উহা প্রায়ই গোজাতীয় জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট। শিশুদের পেটের ভিতরকার ও গলার চতুঃপার্শ্বস্থ বীচিগুলি আক্রান্ত হয়। সন্ধিস্থল ও হাড় প্রভৃতির ক্ষয়ও এই জাতীয় জীবাণু দ্বারাই হইয়া থাকে। তাই বলিয়া শিশুদের যক্ষ্মাও বিরল নয়। অনেকের বিশ্বাস যে, গোজাতীয় জীবাণু দুগ্ধের সহিত খাদ্যপথে প্রবেশ করে এবং অভ্যন্তরে অবস্থান্তর ঘটায় এবং উহা মনুষ্যজাতীয় জীবাণুতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ফুস্‌ফুস্‌কে আক্রমণ করে ও যক্ষ্মা ব্যাধির সৃষ্টি করে। কিন্তু এ কথা একবারও ভাবিয়া দেখা হয় না যে, ছেলেপিলেরা সর্ব্বদাই মাটিতে হামাগুড়ি দেয়, গড়াগড়ি খায়। আর হয়ত এই মাটিতেই থুতুর সহিত পরিত্যক্ত জীবাণু শুকাইয়া ধূলিরূপে পরিণত হইয়া আছে। ছেলেদের স্বভাবই এই যে, তাহারা হাতের সম্মুখে যে জিনিসই পায়, তাহাই মুখে তুলিয়া দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধ ভিন্নও তাহারা এইরূপে প্রথমেই মনুষ্যজাতীয় জীবাণু গলাধঃকরণ করিতে পারে। শিশুদের পাকস্থলীর রসের অম্লতা বয়স্কগণের অপেক্ষা ঢের কম; সুতরাং উহার ভিতর ক্ষয়জীবাণু বর্দ্ধিত হইবার বেশ সুযোগও পায় এবং এখান হইতে পেটের ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুস্ অবধি যাইতে পারে।

শিশুদের ক্ষয়ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

এই একই কারণে ইহাও অধিক সম্ভব যে, শিশুরা শ্বাসের সহিত ধূলিযুক্ত ক্ষয়-জীবাণু গ্রহণ করে এবং উহা সোজা শ্বাসপথে যাইয়া ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মা সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের শিশুরা প্রায় ফুটান (boiled) দুধ খায়। সুতরাং দুধের সহিত এদেশের শিশুদের মধ্যে ক্ষয়বীজ প্রবেশ করা তত সম্ভব নহে। জাপান ও চীনের লোকেরা দুধ একরূপ খায় না বলিলেই হয়, কিন্তু তাহাদের শিশুদের মধ্যেও এ ব্যাধির অভাব নাই।

আমাদের দেশে যদিও ছেলেদের বীচি জাতীয় (Glandular) ক্ষয় ব্যাধি তত হয় না, কিন্তু যক্ষ্মা একান্ত বিরল নয়। একমাত্র উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই উহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

আর একটি কথাও এই স্থানে উল্লেখ করিলে ভাল হয়। আমাদের দেশে শিশুদিগের মাতৃস্তন্যই প্রধান আহার্য্য। মাতার যক্ষ্মা থাকিলে উহার স্তন্যপানজনিত সন্তানেরও যক্ষ্মা হইতে পারে। এ বিষয়ে এদেশে মোটেই সতর্কতা অবলম্বিত হয় না। মাতার এই ব্যাধি থাকিলে সন্তানকে কোনক্রমেই স্তন্যদান করা উচিত নহে। ইহাতে কেবল যে সন্তানের অনিষ্ট হয়, তাহা নহে, মাতারও বিশেষ অনিষ্ট হয়। স্তন্যদানে মাতা ক্রমেই হীনবল হইতে থাকেন এবং ব্যাধির প্রকোপও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ব্যাধিগ্রস্ত মাতার স্তন্যপান সন্তানের উচিত কিনা ?

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল ফুস্‌ফুসের ব্যাধি সম্বন্ধেই আলোচনা

করিয়াছি। হাড়, গাঁট প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের ক্ষয় যে কিরূপে উৎপাদিত হয়, সে সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। এ সম্বন্ধে সকল কথা আমরা জানিও না। প্রায়শঃই নিকটস্থ কোন ক্ষতমুখে ক্ষয়বীজ প্রবেশ লাভ করে এবং গাঁট প্রভৃতি আক্রমণ করে। ঐ ক্ষতগুলি সময় সময় এত সূক্ষ্ম থাকে যে, আমরা উহার অস্তিত্বই উপলব্ধি করিতে পারি না, চোখে দেখা ত দূরের কথা। অথবা এমনও হইতে পারে যে, ক্ষয়বীজ ক্ষতমুখে কোন রক্তবাহী নাড়ীর (Blood vessels) ভিতর প্রবেশ লাভ করিতে পারে এবং যেখানে কোন দুর্ব্বল অঙ্গ পায়, সেই স্থানে আক্রমণ করে। মনে করুন, এক জনের হাঁটুতে আঘাত লাগিয়া উহা দুর্ব্বল হইয়াছে। এমন সময় যে শিরায় উহার রক্ত যোগায়, তাহার মধ্যে যদি কোনক্রমে ক্ষয়বীজ প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তবে সহজেই উক্ত হাঁটু আক্রান্ত হইতে পারে। রসবাহী শিরা (Lymphatics) যোগেও এইরূপ আক্রমণ হইতে পারে। এইরূপে স্থানীয় আক্রমণ হইতেও ব্যাধি পুনরায় সাধারণভাবে সমস্ত শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে।

অন্যান্য স্থানের ব্যাধি

আমরা যদি এখন কতকগুলি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, তবে এই ব্যাধি নিবারণ করিতে আমাদের বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইবে না। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, ক্ষয়-জীবাণু ব্যতীত ক্ষয় উৎপাদিত হইতে পারে না।

ব্যাধি নিবারণের উপায়।

আর এই ক্ষয়-জীবাণু হয় থুতু, না হয় দুধ, না হয় মাংসের সহিত আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। ক্ষয়-জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলেই যে আমরা ক্ষয়গ্রস্ত হইব, এমন কোন কথা নাই।

আমাদের কোন অপকারে আসিতে হইলে উহাদের অনেকগুলির প্রয়োজন। হঠাৎ দুই একটা আসিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারে না। কিন্তু উহারা কখন আসে, কখন বা না আসে, তাহা জানিবার সহজ কোন উপায়ই নাই। আমরা যাহাতে সর্ব্বদা ক্ষয়বীজ হইতে দূরে থাকিতে পারি, সর্ব্বদা সেই চেষ্টাই দেখা উচিত। আমাদের স্বাস্থ্য যখন সম্পূর্ণ ভাল থাকে, আমরা যখন বিশেষ সবল থাকি, তখন উহাদের ছোটখাট দল দেহে প্রবেশ করিয়াও সহজে কিছু করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন কারণে অসুস্থ হইয়া পড়ি, দেহের সাধারণ আত্মরক্ষার শক্তি যদি কমিয়া যায়, তবে অল্পসংখ্যক শত্রু দ্বারাও নিষ্পেষিত হইতে পারি। সুতরাং অসুস্থতার সময় আমরা যাহাতে এই সব ক্ষয়রোগীর বা ক্ষয়-জীবাণুর সংস্পর্শে না আসি, সে জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। দুধকে আমরা কিছু কালের জন্য ফুটাইয়া লইলেই উহার দোষ দূর হয়। তবে উহা যে সব স্থান হইতে সরবরাহ করা হয় এবং বাজারে যে সব স্থানে উহা বিক্রীত হয়, সে সব স্থান একজন স্যানিটারী ইনস্পেক্টার দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। মাংস সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযুজ্য। রীতিমত পরীক্ষা করার পর উহাকে সিদ্ধ করিয়া লইলে উহাতে দোষ থাকা সম্ভব নহে।

থুতু সম্বন্ধেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখনই কোন যক্ষ্মারোগী কাসে, হাঁচে বা কথা কহে,

থুতু

তখনই তাহার চতুর্দ্দিকে থুতু সূক্ষ্মাকারে নিক্ষিপ্ত হয় ও তাহা ক্ষয়-জীবাণুপূর্ণ। সুতরাং কোন যক্ষ্মারোগীর নিকট যাইতে হইলে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক, যেহেতু ঐ সব জীবাণু শ্বাসপথে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিলেই যক্ষ্মা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবশ্য, যক্ষ্মারোগীর নিকট গেলেই বা দুই চারিটি যক্ষ্মা-বীজাণু দেহে প্রবেশ করিলেই যে ঐ ব্যাধিতে আক্রমণ করিবে, এমন কোন কথা নাই—তবে আশঙ্কা ত আছে! প্রতিবার কত সংখ্যক জীবাণু দেহে প্রবেশ করিতেছে, তাহা যখন আমরা দেখিতে পাই না, তখন সতর্কতা অবলম্বনে দোষ কি? এইরূপ একবারে না হয়, একাধিকবারে জীবাণু যদি ক্রমাগতই শরীরে প্রবেশ করিতে থাকে, তবে যক্ষ্মার আক্রমণ হইতে কতক্ষণ?

সদ্য সদ্য ফল ফলে না বলিয়াই কি এত অসাবধানতা? এ সম্বন্ধে লোকে এতই অসাবধান যে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। একত্রে বসিবে, গল্পগুজব করিবে, একত্রে খাইবে বেড়াইবে, এমন কি, এক সঙ্গে এক বিছানায় পর্য্যন্ত শয়ন করিবে —কেন? উহা যে কতদূর অন্যায় এবং কতদূর অর্ব্বাচীনের কাজ, তাহা বলা যায় না। এই অসাবধানতা যে শুধু অজ্ঞানতার দরুন, তাহা নহে। কারণ, তাহাদিগকে যদি এ সম্বন্ধে সবিশেষ বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, ইহা হইতে বহু বিপদ্ আসিতে পারে,

তাহা সত্ত্বেও তাহারা বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয় না। এই কু-অভ্যাস আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এত গভীরভাবে বদ্ধমূল যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহা দূর করা যাইতেছে না। ইহা কি কম পরিতাপের কথা!

যক্ষ্মারোগী যদি অসাবধান হইয়া যেখানে সেখানে থুতু ফেলে, তবে তাহার মত আপদ্ আর নাই। থুতু হইতে এ রোগ যত বিস্তৃত হইতে পারে, এরূপ আর কিছু হইতে হয় না।

থুতুগুলি আস্তে আস্তে শুকাইতে থাকে এবং ধূলি বালু দ্বারা আবৃত হইয়া সূক্ষ্ম কণাকারে বায়ুদ্বারা যেখানে-সেখানে নীত হয়। অন্ধকার স্থানে পৌঁছিলে ত কথাই নাই! সেখানে যে কত দিনের মত পাঠ স্থাপন হইল, সে কথা কেহই বলিতে পারে না। ইচ্ছা করিলে আমরা যক্ষ্মারোগীর নিকটে না যাইতে পারি; আর যদিই বা যাই, তাহা হইলেও খুব নিকটে না গেলে তেমন একটা আক্রমণের ভয় থাকে না। কিন্তু ধূলির সঙ্গে মিশিয়া ক্ষয়বীজ কোথায় কোন্ স্থানে থাকে, তাহা ত জানিতে পারি না। কাজেই এইরূপে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। সুতরাং যক্ষ্মারোগীর যেখানে সেখানে থুতু ফেলা যে সাধারণের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক, এ কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত এবং উহা যাহাতে নিবারিত হয়, সে সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পাত্রে থুতু ফেলাই ভাল, উহার ভিতর যদি কোন পচন-নিবারক লোশন (Antiseptic lotion) থাকে, তবে আরও ভাল হয়, একান্ত পক্ষে জল থাকিলেও চলে।

কারণ, যে পর্য্যন্ত থুতু না শুকাইবে, সে পর্য্যন্ত ততটা ভয়ের কারণ নাই। উহা শেষে আগুনে পোড়াইয়া দিলেই শত্রু নির্ম্মূল হয়। একান্ত পক্ষে ড্রেনে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন রোগী রুমালে থুতু মুছিয়া রাখেন। যদিও যেখানে সেখানে ফেলার চেয়ে উহা ভাল, তথাপি উহাও কর্ত্তব্য নহে। রুমাল হইতে জীবাণুগুলি পকেটে লাগিয়া থাকিতে পারে। হাতে, জামায় ও অন্যান্য স্থানেও লাগিতে পারে। আর প্রত্যেকবার একখানি রুমাল পোড়াইয়া ফেলাও বড় একটা সহজ কথা নহে। তবে আজকাল খুব সস্তা একরূপ জাপানী কাগজের রুমাল পাওয়া যায়, উহা প্রত্যেকবার নূতন ব্যবহার করা যায় সত্য, তবে উহা রাখিবার জন্য একটী আধার থাকা প্রয়োজন। একটী থলিয়া কি ব্যাগ রাখিলে চলিতে পারে। রাস্তায় রুমাল ব্যবহার করিবার পরই উহার মধ্যে রাখিয়া দেওয়া যায় এবং বাড়ী ফিরিয়া ঐগুলি পোড়াইয়া ফেলা যায়। এই থলিয়া বা ব্যাগ এমন জিনিষের তৈয়ারী হওয়া কর্ত্তব্য যে, উহা পচন-নিবারক ঔষধাদি দ্বারা শোধন করিয়া লওয়া চলে। রাস্তায় বেড়াইবার সময় সঙ্গে লইবার জন্য আজকাল বেশ [illegible] জনক পাত্র পাওয়া যায়—যেমন ডেট্‌ভিলারের পকেট ফ্লাস্ক (Dettweiler's pocket flask)। ইহার মধ্যে থুতু সহজেই ত্যাগ করা যায়। ইহার উপরে ও নীচে উভয় দিকেই খোলা [illegible] স্ক্রু-যোগে আটকান থাকে। উপরের দিকে খুলিয়া ভিতরে থুতু ত্যাগ করিতে হয়, নীচের দিকে খুলিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। উহার একটী ছবি পরপৃষ্ঠে দেওয়া হইল।

কোন কোন দোয়াতের ভিতর যেরূপ থাকে, ইহার ভিতরে সেইরূপ একটি ফানেলের (funnel) মত আছে, ইহা থাকায় পকেটে ঝাঁকি লাগিলে, এমন কি, সময় সময় উহার মুখটা খোলা থাকিলেও থুতু গড়াইয়া পড়ে না।

ডেটুভিলারের পকেট ফ্লাস্ক

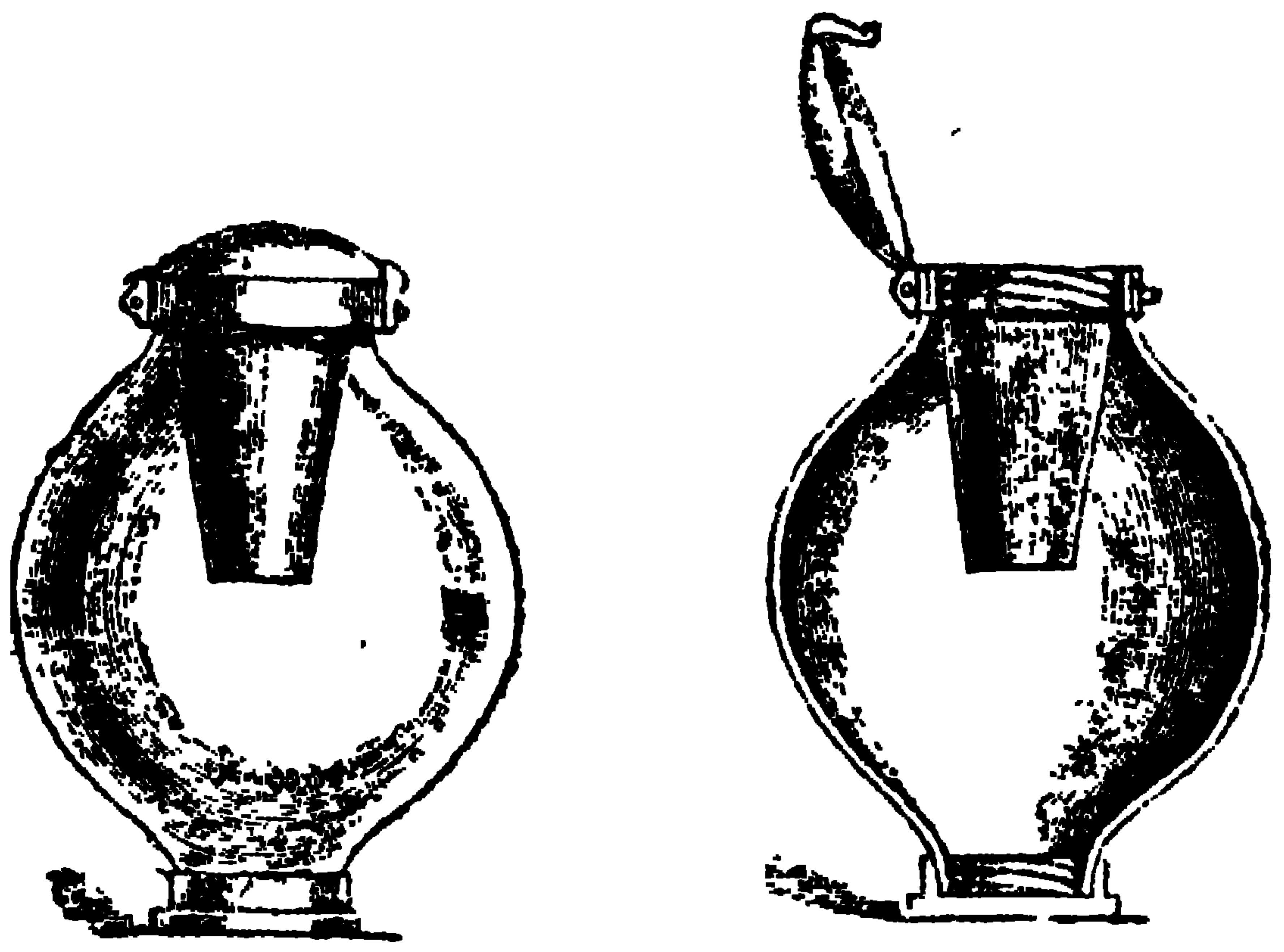

বন্ধমুখ খোলামুখ

বিংশ শতাব্দীর অশেষ কঠোরতার মধ্যে মানবজীবন রক্ষা করা একেই ত দুরূহ ব্যাপার, তাহার উপর চাক্ষুষ, অচাক্ষুষ, সমস্ত প্রাণীই যদি ইহার বিরুদ্ধে একভাবে না হয় অন্য ভাবে দাঁড়ায়, তবে নিরীহ মানুষগুলি যে একান্তই নিরুপায় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে মশার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা কে না জানে ? গুন্‌গুনানি ভিন্ন উহার যে অপর কার্য্যও আছে, এ কথা কে মনে করিয়াছে ? মক্ষিকাকুল দংশন করে না সত্য, কিন্তু যেরূপভাবে

মক্ষিকার কার্য্য

শত্রুতাসাধন করে, তাহা অপেক্ষা দংশনও যে অনেক ভাল ছিল! এই মক্ষিকা সহযোগে নানাবিধ ব্যাধি বিস্তৃত হয়। এখানে সে সব দীর্ঘ গবেষণা না করিয়া মক্ষিকাদ্বারা ক্ষয়ব্যাধি কিরূপে বিস্তৃত হয়, সংক্ষেপে শুধু তাহারই আলোচনা করিব। মাছিগুলি সচরাচর ক্ষয়-জীবাণুপূর্ণ থুতুর উপর বসে এবং তথা হইতে উড়িয়া খাদ্য সামগ্রীর উপর পড়ে। এইরূপে খাদ্য সামগ্রীর সহযোগে ক্ষয়-জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং ক্ষয় উৎপাদনের কারণীভূত হয়। মাছিগুলি যখন থুতুর উপরে বসে, তখন শান্তশিষ্ট ঋষিবালকের মত বসে না, যেন কিছুই খাইবে না ছুঁইবে না; পরন্তু থুতুগুলি বা ক্ষয়-জীবাণুপূর্ণ অন্য খাদ্য-সামগ্রী উদরপূর্ত্তি করিয়া ভক্ষণ করে, এবং উদরাভ্যন্তরে ক্ষয়-জীবাণুর একটা বস্তী সৃজন করে। ইহা কল্পনার কথা নহে—উহাদের পেটের ভিতর এই জীবাণু একান্ত জীবন্ত অবস্থায় দেখা গিয়াছে। এক স্থানে যাইয়া জীবাণু সংগ্রহ করে এবং অপর স্থানে খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিয়া সেই জীবাণু বমন করে। মাছিগুলি এইরূপে ক্ষয়ব্যাধি বিস্তারে সহায়তা করে। সুতরাং কোন ক্ষয়-জীবাণুসংস্পৃষ্ট স্থানে যাহাতে ইহারা না বসিতে পারে, তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং যাহাতে উহারা আমাদের আহার্য্য সামগ্রীর উপর বসিতে না পারে, তাহাও দেখিতে হইবে।

যে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইল, তাহা হইতেই কিরূপে এই ব্যাধি দূর করা যাইতে পারে এবং ইহার সংক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা সম্ভবপর হয়—তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই ব্যাধি সম্বন্ধে জনসমাজকে শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এই ব্যাধির বাস্তবিক কারণ কি, কিরূপে ইহা সংক্রামিত হয় ও কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার সংক্রমণ নিবারিত হয় এবং ব্যাধি আসিয়া পড়িলে কিরূপে উহার সহিত সংগ্রাম করিয়া ইহাকে বিনাশ করা যায়, এই সকল একবার বিশদরূপে বুঝিতে পারিলে এই ব্যাধিকে দূর করিতে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। উহা নিম্নলিখিত কয়েক উপায়ে হইতে পারে,—

জনসাধারণের শিক্ষা

১। অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা এই ব্যাধি সম্বন্ধে জনসমাজে বক্তৃতা দেওয়া।

২। ছায়াচিত্রের সাহায্যে ইহার স্থূল মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া।

৩। সহজ সরল ভাষায় এই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ প্রবন্ধ বা পুস্তিকা বিতরণ।

এই স্থানে আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় বলা দরকার। এই ব্যাধি একজন হইতে অপর জনে সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও ইহা ছোঁয়াচে নহে। বসন্ত রোগীকে ছুঁইলেই যেমন ঐ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, ক্ষয়রোগে সে আশঙ্কা আদৌ নাই। ক্ষয়রোগীর নিকট সর্ব্বদা যাতায়াতে উহার জীবাণুপূর্ণ থুতু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে এবং মাত্র এইরূপেই উহা সংক্রামিত হয়। থুতু সম্বন্ধে যে সব সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

ব্যাধি সংক্রামক, কিন্তু ছোঁয়াচে নহে।

এ বিষয়ে সূর্য্যের আলো ও নির্ম্মল বায়ুর উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্ষয়-জীবাণু সূর্য্যালোকে ও উন্মুক্ত বায়ুতে অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বত্র যাহাতে উভয়েই প্রচুর পরিমাণে আসিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

আলোক ও বায়ুর উপকারিতা

এই ব্যাধি সহরে বেশী হয়। সহরে বাটী নির্ম্মাণকালে আলোক ও বায়ু গমনাগমন বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না। এক বাটীর গায়ে আর এক বাটী উঠিতেছে; উভয়ের মধ্যে একটু নিশ্বাস ছাড়িবার স্থানও থাকে না। চারিদিকে খোলা জায়গা ত প্রায় কোন বাটীতেই নাই। কেবল পাশাপাশিই এইরূপ, তাহা নহে, বাড়ীর পশ্চাতেও এইরূপ। কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় সহরে জায়গা দুর্ম্মূল্য সত্য এবং আমাদের দেশের লোকের আয় যেরূপ সামান্য এবং সাংসারিক অবস্থা যেরূপ নিঃস্ব, তাহাতে বাড়ীর ভিতরে খোলা স্থান রাখা বড় সহজ কথা নহে। তবে জীবনের চেয়ে কিছুই বড় নয়। একটী আলোক-বায়ুশূন্য বাটীর জন্য যে কেবল নিজেকেই ভুগিতে হয়, তাহা নহে, পরন্তু সকলকে পুরুষানুক্রমে ভুগিতে হয়। বাটী নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এই সব কথা বিশেষরূপে চিন্তা করা আবশ্যক।

আমাদের মিউনিসিপালিটিরও (Municipality) এ বিষয়ে বিশেষ ত্রুটি আছে। কমিশনারগণ হয় ত আইন করিলেন যে, বাটীর খানিকটা অংশ

মিউনিসিপালিটির কর্ত্তব্য

অবশ্যই খোলা রাখিতে হইবে, কিন্তু তাহা দেখিবার লোক কোথায় ?

আইনে ত আছে যে, বাটীর এক তৃতীয়াংশ খোলা রাখিতে হইবে, কিন্তু কয়খানা বাটীতে তাহা রাখা হয় ? আইনের অপ্রয়োগই অধিকাংশ সময়ে ঘটে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় ও দেশের বিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। আমরা, যাহারা রোজ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াই এবং দেখিতে পাই যে, সহরের অধিকাংশ ব্যাধিরই সূচনা এই সব আলোক-বায়ুহীন বাটীতেই হইয়া থাকে, তাহাদের এ সব কথা একটু জোরের সহিত বলিবার অধিকার আছে। এই সব বাড়ী হইতে যদি রোগীকে ভাল বাড়ীতে লইয়া যাওয়া যায়, তবে তাহাদের যে কিরূপ দ্রুত উন্নতি হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আশা করি, মিউনিসি-প্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইবেন। বাটীর চতুষ্পার্শ্বে কতকটা খোলা জায়গা থাকা দরকার, অন্ততঃ পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ ভূমি খোলা রাখা নিতান্তই আবশ্যক।

যাহাতে সকল গৃহেই রীতিমত দরজা জানালা খোলা থাকে, তাহাও দেখা আবশ্যক। এমন অনেক গৃহ আছে, যাহার মধ্যে কস্মিন্ কালেও আলোক প্রবেশের পথ নাই; এমন অনেক ঘর দেখা যায়, যাহার একটীমাত্র দরজাই সম্বল এবং উহা বন্ধ করিয়া দিলে বায়ু চলাচলের আর কোন পথই থাকে না। ইহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত অথবা কল্পনাপুষ্ট নহে।

রান্নাঘরগুলি শয়নঘর হইতে পৃথক্ হইলে ভাল হয়।

অনেক স্থানেই শয়ন-কোঠার নীচের কোঠাখানিই রান্নাঘররূপে ব্যবহৃত হয়। উহাতে ঘর বাড়ী, কাপড় চোপড়ই যে শুধু অপরিষ্কার হয়, তাহা নহে, স্বাস্থ্যও চিরকালের মত ভগ্ন হয়। ছাতের উপর রান্নাঘর হইলে কতক বিষয়ে অসুবিধা থাকিলেও স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেকটা ভাল। রান্নাঘর যদি পৃথক্ রাখা একান্তই সম্ভবপর না হয়, তবে উহা হইতে যাহাতে সহজে উর্দ্ধপথে ধূম নির্গত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ধূম বহির্গমনের চিম্‌নী থাকিলে বেশ ভাল হয়।

রান্নাঘরের ব্যবস্থা

বাটীর মধ্যে যে ঘরগুলি সকলের চেয়ে অব্যবহার্য্য, আমরা সচরাচর সেগুলিকেই রান্না ও খাওয়ার ঘরে পরিণত করি। হয় ত জানালামাত্র নাই; দরজা একটীমাত্র। আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশ পাকশালাতেই জানালার নামগন্ধ নাই এবং ঐ সব ঘরে কোন প্রকারেই আলোক বায়ুর প্রবেশ সম্ভবপর নহে। যাঁহারা আমাদের সকলের অধিক প্রিয়, সেই মা বোন স্ত্রীদের আমরা কি সুবিধাই না দেখি! একবারও ভাবি না, এই আলোক-বায়ুহীন ঘরগুলিতে অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ ও শুষ্ক হইয়া তাঁহাদের জীবনদীপ কতক্ষণ উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে পারে? যাঁহারা আমাদের রান্নাঘরের অবস্থা জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের মেয়েদের বারো আনা রোগেরই সূত্রপাত এইখানে।

এই সঙ্গে আরও দুই একটী আবশ্যকীয় কথা বলিবার লোভ-

সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি এখন যে বিষয়টি বলিব, সে সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতে চাই। কথাটি এই যে, আমাদের শয়ন-গৃহে যত লোক বাস করিবার বন্দোবস্ত আছে, সাধাণতঃ তাহা হইতে সর্ব্বদাই অধিক লোক থাকে। যেখানে ১০ জন থাকিবার মত স্থান আছে, সেখানে যদিও বা ২০ জন না-ই থাকুক, ১৫ জন থাকেই থাকে। ইহা যে কতদূর অপকারী, তাহা বলিতে পারি না। ইহাতে কেবল যে নানা বিষয়ে অসুবিধা হয়, তাহা নহে, শুধু এই কারণেই অনেকের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, জন্মের মত আর শোধরাইবার উপায় থাকে না। দেশ যেরূপ গরীব, তাহার উপর একান্নবর্ত্তিতার প্রথা থাকায় এ বিষয়ে কোন সংস্কার করিয়া উঠা সহজ ব্যাপার নহে। বলিতে গেলে, ইহা একটি কঠিন সমস্যা। কিন্তু আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, ইহা হইতে আমাদের সমূহ অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন ইহার প্রতিকার অবশ্যকর্ত্তব্য। ধরুন, কোন ভদ্রলোক বাসের জন্য একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিলেন। তাঁহার তিনটি ছেলে আছে। তাঁহার মৃত্যুকালে ছেলেদের প্রত্যেকের হয় ত ৩।৪টী করিয়া ছেলেমেয়ে জন্মিয়াছে। অথচ পোষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহবিস্তারের আদৌ ব্যবস্থা হয় নাই। এখন তিন জনে তিনটি বাটিতে থাকিলে তবে সঙ্কুলান হয়। তাহা না করিয়া যাহা একের ছিল, দেয়াল গাঁথিয়া লইয়া তিনের উপযোগী করা হইল।

গৃহে লোক-বাহুল্যের অপকারিতা

রান্নাঘর হয় ত একটির বেশী দুইটী ছিল না ; এখন উহারই দরকার তিনটি। অতএব এই তিনটি স্বতন্ত্র পরিবার কোথায় রাঁধে, কোথায় বা থাকে ? এই ত আমাদের অবস্থা ! ঐ বাটীতে এতগুলি লোক বাস করিলে উহা জনাকীর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ও ব্যাধির আকর হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ জন-বহুল গৃহে ক্রমশঃই মলমূত্রত্যাগের অসুবিধা ও স্নানাহারের অনিয়মে আমরা বহুবার বহু দুষ্ট ব্যাধির আক্রমণ হইতে দেখিয়াছি। সুতরাং গৃহ যাহাতে জনাকীর্ণ না হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব।

আরও একটি কথা বলিবার আছে। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন মানুষ মাত্রেরই আছে এবং তাঁহাদের যাতায়াত একান্তই স্বাভাবিক এবং উহাতে সকলেই আহ্লাদিত হয়। আমাদের দেশের এমনই প্রথা হইয়া পড়িয়াছে যে, সে কোন আত্মীয়-গৃহে যাইতে হইলে অধিকাংশ সময়েই পূর্ব্বে একটা খবর দেওয়া আবশ্যক মনে করি না। আমরা ভাবি, অমুক ত আমার নিকট আত্মীয়, তাঁহার বাড়ীতে যাইতে আবার একটা খবর দেওয়ার প্রয়োজন কি ? পাড়াগাঁ হইলে না হয় কোন কথা থাকে না ; কারণ, সেখানে স্থানের অভাব মোটেই নাই। সহরে নিজেরাই হয় ত অতি কষ্টে অকুলান স্থানে বাস করিতেছে, তাহার উপর যদি আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হন, তবে যে কি পরিমাণ কষ্ট ও দুর্দ্দশা হয়, তাহা বলা যায় না। যদি একমাত্র

কষ্টের কারণই হইত, তবে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। ইহা হইতে যে কত সময় লোকের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আত্মীয়গণ অধিকাংশ সময়েই চিকিৎসার্থ পীড়িত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া সহরে আইসেন। সে সময়ে কষ্টের অবধি থাকে না। এই অভ্যাস আমাদের দূর করিতে হইবে। আমি এমন কথা মোটেই বলি না যে, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে কেহ স্থান দিবেন না। যেখানে স্থান আছে, সেখানে স্বচ্ছন্দে আসুন; কিন্তু যেখানে স্থানাভাব, তথায় না যাওয়াই ভাল। অন্ততঃ পূর্ব্বে খবর লইয়া এবং তাঁহাদের কোন অসুবিধার কারণ হইবে কি না, এ সম্বন্ধে জানিয়া তবে যাওয়া উচিত। আমাদের দেশ চির অতিথি-বৎসল, নিজেরা নিত্যই সহস্র কষ্ট সহিয়া আত্মীয় বন্ধুদের আদর ও তুষ্টির জন্য সকলে সততই উদ্‌গ্রীব; সুতরাং তাঁহাদের কথা আর অধিক কি বলিব? এ বিষয়ে আমরা সকলেই অপরাধী। সকলের অভ্যাসেরই পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

দেশ দরিদ্রপ্রধান।

আমাদের দেশ দরিদ্রপ্রধান। অধিকাংশ লোকের এমন শক্তি নাই যে, যে সব গৃহে আলোক ও বায়ু স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করে, এমন গৃহে তাহারা বাস করিতে পারে। সুতরাং তাহাদের জন্য উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ করা প্রয়োজন।

সহরে এইরূপ দরিদ্র অধিবাসিগণের নিমিত্ত গৃহাদি প্রস্তুত

করিয়া বিনা লাভে, অতি অল্প টাকায় ভাড়া দেওয়া মিউনিসিপালিটির কর্ত্তব্য। ধনী, পরদুঃখকাতর দয়ালু ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন।

মিউনিসিপালিটির ও ধনীদিগের কর্ত্তব্য

আমাদের আফিস, কাছারী, স্কুল, কলেজ, বায়স্কোপ, থিয়েটার, কল, কারখানা প্রভৃতি যে সব স্থানে বহু জনসমাগম হয়, তথায় আলোক ও বায়ু চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাসগৃহ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল যে গৃহেরই এই সব ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহা নহে। রাস্তাঘাটগুলিও সরল ও সুপ্রশস্ত হওয়া দরকার। সহরে নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য নানা স্থানে খোলা জায়গা ও উদ্যান থাকা একান্ত আবশ্যক। সহরের এই মুক্ত স্থানগুলি দেহের ফুস্‌ফুসস্থানীয়। ফুস্‌ফুস্‌ যেমন দেহের দূষিত রক্তকে শোধিত করিয়া জীবন রক্ষার সহায়তা করে, এই মুক্ত স্থানগুলিও সেইরূপ গৃহে দূষিত-বায়ুসেবী লোকদিগকে নির্ম্মল বায়ুদানে জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দেয়।

সর্ব্বত্রই যদি সূর্য্যের কিরণ যাইবার বন্দোবস্ত করা যায়, তবে ক্ষয়-রোগ অনেকটা কম হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে সূর্য্যকিরণের তেজ খুব বেশী, এই জন্য ইউরোপ অপেক্ষা উহার দ্বারা আমরা বেশী উপকার পাই। কিন্তু সংসারে কোন জিনিসই অবিমিশ্র ভাল নয়। আমরা বেশী আলো পাই সত্য, কিন্তু ঐ কারণেই জায়গাগুলি বেশী শুষ্ক ও ধূলিময় হইবার বেশী উপযোগী। ক্ষয়-জীবাণুগুলি কিয়ৎক্ষণ আলোর সংস্পর্শে আসিলেই মারা

পড়ে, কিন্তু বেশী ধূলি থাকার দরুন সহজেই আবরণ পায় ও উহাদের জীবন রক্ষার একটা উপায় হয়। এখানে বায়ুর গতিও বেশী; সেই জন্য এই ধূলি-বিমণ্ডিত জীবাণুগুলি সহজেই নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হয় এবং ব্যাধিও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা পায়। সুতরাং আমাদের সহরের রাস্তাগুলি এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত, যাহাতে অধিক ধূলি না হইতে পারে, অথবা তৈল, আলকাতরা বা জলসেচন দ্বারা উহার ধূলি যাহাতে উড়িতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

যে সব কাজে ক্ষয়-রোগ হওয়ার আশঙ্কা

কতকগুলি ব্যবসায় আছে, যাহাতে লিপ্ত হইলে অনেক সময় ক্ষয়রোগকে উদ্যোগ করিয়া ডাকিয়া আনা হয়। যে সব কাজে পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা উৎক্ষিপ্ত হয় এবং নিকটে থাকিলে উহা ফুস্‌ফুসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই সব কাজ করিতে গেলে ক্ষয়রোগ হইবার সমূহ সম্ভাবনা। যাহারা ছুরি কাঁচি প্রভৃতি শান দেয় বা তৈয়ারী করে, চীনা মাটির বাসন প্রস্তুত করে, সোনা প্রভৃতি ধাতব খনিতে কাজ করে, কয়লা, অভ্র প্রভৃতির খনিতে কাজ করে, চূণ বা সুরকীর গুদামে থাকে, পাটের আঁশ ছাড়ায়, পাট বা শনের গুদামে কাজ করে, তুলা ধুনে, চাউলের কলে কাজ করে ও যাহারা ঝাড়ুদার, বিশেষতঃ যাহারা সহরের রাস্তা ও হাঁসপাতাল প্রভৃতি ঝাঁট দেয়, তাহাদের মধ্যে অনেককেই যক্ষ্মাকাসে ভুগিতে দেখা যায়। দর্জ্জি ও তাঁতিদের মধ্যে ইহা খুব অধিক দেখা যায়। রেল-বিভাগের

ষ্টেশন মাষ্টার ও কেরাণীদের মধ্যেও ইহা বেশ হইয়া থাকে। এই সব লোকদের প্রায় ২৪ ঘণ্টাই ডিউটীতে (duty) থাকিতে হয় বা আলোক-বায়ুশূন্য স্থানে থাকিতে হয় বলিয়াই ইহাদের উপর এই ব্যাধির আক্রমণ এত বেশী!

কতকগুলি ব্যারাম আছে, যাহা হইলে রোগীর ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্লুরিসির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হাম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের শেষে ক্ষয়রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এই সব ব্যাধির পর শরীর যাহাতে সত্বর সবল হয়, তজ্জন্য সচেস্ট হওয়া কর্ত্তব্য। এই সব ব্যাধিতে শরীরকে এত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করে যে, ক্ষয়রোগ অতি সহজেই আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। উপদংশ (syphilis) ও বহুমূত্রের উপর এই পীড়া হইলে বা এই পীড়ার উপর উহাদের আক্রমণ হইলে, ইহার গতি অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং আরোগ্যের আশা অতি ক্ষীণ হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানে ও ব্যভিচারে এই ব্যাধি সহজেই শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়।

যে সব রোগ হইতে ক্ষয় কাস হওয়ার আশঙ্কা

আরও কতকগুলি কারণে এই ব্যাধি প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায়। ইহার মধ্যে দারিদ্র্য ও দৌর্ব্বল্যই প্রধান। দারিদ্র হইলেই অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে হয়, ভাল আলো বায়ুর ব্যবস্থা হইয়া উঠে না, পুষ্টিকর খাদ্য দূরে থাকুক, দুই বেলা

দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্য-হীনতা।

পেট ভরিয়া খাওয়াই তাহাদের দুঃসাধ্য। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা বর্ত্তমানে খুব বাড়িয়া গিয়াছে। আয়ের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। কাজে দারিদ্র্যের পেষণে ক্রমেই হৃতবল হইয়া শত শত লোক এই সকল ব্যাধির কবলিত হইতেছে। বাস্তবিক, দরিদ্রের ব্যাধি বলিয়া যদি সত্য সত্য কিছু থাকে, তবে তাহা এই ক্ষয়রোগ।

আধুনিক সভ্যতার ফলে সর্ব্বদাই একটা ছুটাছুটির ভাব জাগিয়া আছে। জীবনের তার এত টানায় থাকে যে, আর একটু টান পড়িলেই যেন ছিঁড়িয়া যাইবে; ফলে, শরীরে কিছুমাত্র শক্তি থাকে না; ব্যাধিকে দূর করিয়া দিবার দেহের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা, তাহা সম্পূর্ণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, মনটা স্ফুর্ত্তিহীন ও ভারবিশেষ বলিয়া জ্ঞান হয়। ফলে, ইহাদের সন্তানসন্ততিগণও সবল ও সুস্থ হইতেছে না এবং সহজেই এই ব্যাধির আক্রমণে ধ্বংস হইতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের কষ্ট আরও বেশী হইয়া পড়িয়াছে এবং এ ব্যাধির প্রকোপও তাঁহাদের মধ্যেই বেশী। তাঁহারা এক দিকে বাহিরের ভদ্রলোকের খোলস রাখিতে যাইয়া, অন্য দিকে অভাবের দারুণ নিগ্রহে ও তাড়নায় একেবারে দলিত ও পিষ্ট হইতেছেন। যে পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকারের একটা উপায় না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত এ ব্যাধি দূর হইবার সম্ভাবনা নাই।

আধুনিক সভ্যতার ফল

দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকায় অপরিণত বয়সের

অধিকাংশ সন্তানই দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী হইতেছে এবং এই সব ব্যাধির আক্রমণে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে দেশের লোক সজাগ হইতেছে এবং বিবাহের বয়স অনেকটা স্বাভাবিকের দিকে আসিয়াছে। যাঁহারা সবল ও সুস্থ সন্তান আশা করেন এবং যাঁহারা দেশের ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আশা করি, তাঁহারা এ বিষয়ে স্বাধীন চিন্তাদ্বারা বাল্য-বিবাহের অপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। স্ত্রীলোকের ষোড়শ ও পুরুষের পঞ্চবিংশ বৎসরের পূর্ব্বে দেহের গঠন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং উহার পূর্ব্বে বিবাহাদি হইলে তাহাদের সন্তানসন্ততি যে দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাল্যবিবাহ ও বিসদৃশ বিবাহ

বাল্যবিবাহ ব্যতীত আরও একটা দোষ দেখা যায়। পূর্ব্বে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' কথাই শুনা যাইত, এখন তাহা ত আছেই, অধিকন্তু 'প্রৌঢ়স্য বালিকা ভার্য্যাও' চলিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন অনেক পুরুষ আছেন, যাঁহারা ৩০।৪০ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহিত হইতে চাহেন না অথচ কন্যা ১২।১৪ বৎসরের অধিক মিলে না বা তাঁহারাও কেহ কেহ গ্রহণ করিতে রাজী হন না। এই অযৌক্তিক ও বিসদৃশ বিবাহ সবল ও সুস্থ সন্তান উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত নহে।

বয়সের এতটা বেশী পার্থক্য হইলে অনেক সময়েই বালিকা বধূর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে দেখা যায় এবং অধিকাংশ সময়েই তাহার

জীবনের সমাপ্তি হয় ক্ষয়ে। সুতরাং বিবাহের বয়সের এই অসামঞ্জস্য দূর করা কর্ত্তব্য। দেশে যে পর্য্যন্ত সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দারিদ্র্য দূর না হইবে, সে পর্য্যন্ত এ ব্যাধি নিবারিত হইবার আশা দুরাশা মাত্র।

অবরোধপ্রথা

অবরোধ মাত্রই স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। মুক্ত আলোক ও বায়ুতে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইলে দেহের যে সবলতা জন্মে, আর কিছুতেই তাহা হয় না। প্রকৃতির নিত্য নব নব দৃশ্য, সহস্র বৈচিত্র্য ও অসীম সৌন্দর্য্য মনের উপর অতি আশ্চর্য্যভাবে ক্রিয়া করে এবং এই মানসিক প্রসন্নতা দেহের স্বাস্থ্য বিধানে বিশেষ সহায়তা করে। আমরা স্ত্রীজাতিকে এই সব আনন্দ হইতে দূরে রাখিয়া এবং কয়েকটি রুদ্ধগৃহে আবদ্ধ করিয়া সত্যই কি আশা করি যে, তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে? গ্রামে তবুও বা একটু খোলা জায়গা, একটু উন্মুক্ত আকাশ পাওয়া যায়, কিন্তু সহরের ভিতর চারিটি মাত্র দেওয়ালের মধ্যেই তাহাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এমন অনেক বাটী আছে, যাহার ছাদে যাইবার উপায় নাই, অথচ একদিন যে কোথাও বেড়াইতে বাহির হইবে, অধিকাংশেরই অর্থাভাবে তাহারও কোন উপায় নাই। এই অবরোধ-প্রথার দরুন পুরুষ জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মধ্যে ক্ষয়ের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের অবরোধের অধিক কড়াকড়ি বলিয়া মুসলমান রমণীগণের মধ্যে ইহার প্রসার এবং প্রকোপ আরও বেশী।

অল্প বয়সে বিবাহ হইলে আরও একটী বিষময় ফল ফলে। অধিকাংশ মেয়েদেরই বিবাহ ৮।৯ হইতে ১৩।১৪ বৎসরের মধ্যেই হয়। এই সময়টা মেয়েদের বাড়ন্ত সময়। পিত্রালয়ে থাকিতে তাহারা অনেকটা স্বাধীন থাকে এবং আলো বাতাসেরও কতকটা সংস্পর্শে আসিতে পারে; কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পরেই অবরোধে প্রবেশ করায় এবং সেই অবরোধের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়ায় অনেক বালিকার দেহেই এই সব ব্যাধির সূত্রপাত হইতে দেখা যায়। কন্যাবৎসল পিতামাতার এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং ততোধিক মনোযোগ আকর্ষণ করি শ্বশুর শাশুড়ীদের, যাহাতে তাঁহাদের আদরিণী নব পুত্রবধূটির স্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ নজর রাখেন এবং এই অবরোধের কারণেই যাহাতে নববধূদের দেহে ক্ষয় সংক্রামিত না হয়। দেহের বৃদ্ধিকালে যাহাতে তাহারা প্রচুর আলোক ও বায়ুর প্রভাব পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না করিলে দেহ ভগ্ন হইবে এবং ক্ষয় দ্বারা আক্রান্ত হইবার সুযোগ পাইবে।

ইহার উপর আবার দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধিতে লোকগুলিকে বার বার করিয়া দীর্ঘদিন ভোগাইয়া একরূপ আধমরা করিয়া রাখিয়াছে। এই সব ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদের ক্ষয় দ্বারা আক্রান্ত হইতে বেশীক্ষণ লাগে না।

ম্যালেরিয়া
কালাজ্বর

এই ব্যাধি প্রকাশ পাইলে কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয় এবং যাহাতে উহা নানা স্থানে ব্যাপ্ত না হইতে

পারে, তাহারও উপায় হয়। সংবাদটি প্রথম অবস্থায় পাইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার আশা করা যায় এবং তদনুরূপ চেষ্টাও চলিতে পারে। প্রথম অবস্থায় সংবাদ দেওয়াও সহজ নয়। ডাক্তারেরাই এ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিন্ত মত দিতে পারেন না। যখন তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্তে আইসেন, তখন ব্যারাম হয়ত বেশী আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সুযোগ ও মাহেন্দ্রক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও অধিকাংশ সময় ব্যাধিকে কতকটা সীমাবদ্ধ করা যায় এবং যাহাতে এক দেহ হইতে অপরের দেহে সংক্রামিত না হইতে পারে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। সংবাদ দিলে যদি কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা থাকে, তবে উহাতে কাহারও দ্বিধা করিবার কারণ দেখি না। সংবাদ দেওয়ার পরেও অনেক সময় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তাড়নায় এত বিপদে পড়িতে হয় যে, তখন কেবলই মনে হইতে থাকে, কেন খাল কাটিয়া কুমীর আনিলাম! সুতরাং সংবাদ-জ্ঞাপন অবশ্য কর্ত্তব্য (Compulsory) না হইয়া যদি ইচ্ছামত (Voluntary) হয়, তবে বোধ হয় উপকার হইতে পারে। এ সম্বন্ধে এত বেশী কথা বলিবার আছে যে, উহার জন্যই একটা স্বতন্ত্র পুস্তিকার প্রয়োজন।

ব্যাধি হইলে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন কি না

দেশে আপামর সাধারণের জন্য যে দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি আছে, তথায় সব সময়ে এ রোগের চিকিৎসা সুবিধামত হয় না। ইহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় থাকা উচিত। এ বিষয়ে এত

বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে নিত্য এতই নূতন জ্ঞান সঞ্চয় হইতেছে যে, ইহার জন্য বিশেষজ্ঞের (Specialist) একান্ত দরকার। সাধারণ চিকিৎসাগারগুলিতে এই রোগীদের সম্বন্ধে উপযুক্ত মনোযোগ দেওয়ার সুবিধা ত হয়ই না, বরং ইহাদের সংস্পর্শে অপরাপর রোগীদের এই ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা চলিতেছে। আমাদের এ হতভাগ্য দেশে কি ইহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে? ইহা শুধুই লজ্জার বিষয় নহে, অধিকন্তু এই অবহেলার দরুন যাহাদের আরোগ্য হওয়ার খুবই সম্ভাবনা, তাহারাও অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহা কি কম পরিতাপের কথা!

ইহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় আবশ্যক

ক্ষয় রোগের প্রথম অবস্থায় স্বাস্থ্যকর স্থানে গেলে রোগ আরোগ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য যে, ইহার অন্তর্গত বা নিকটে বিশেষ কোন স্বাস্থ্যকর স্থান নাই। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে সাঁওতাল-পরগণার গিরিধি, মধুপুর, বৈদ্যনাথ, যশিদি, রিখিয়া, সিমুলতলা, ঝাঁঝা, মিহিজাম, জামতারা, কর্ম্মাটার, মহেশমুণ্ডা, পরেশনাথ প্রভৃতি বেশ ভাল ও স্বাস্থ্যকর। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে পুরী ও কক্স-বাজারই নিকটবর্ত্তী, ওয়ালটেয়ার, ভিজিগাপটাম, বোম্বাই, কলম্বো প্রভৃতি স্থান দূরবর্ত্তী ও বহু ব্যয়সাধ্য। শৈলাবাসের মধ্যে দার্জ্জিলিং ও

বায়ু পরিবর্ত্তন

কার্সিয়ংই নিকটবর্ত্তী ও সহজগম্য। কালিম্পং বেশী দূরে না হইলেও যাওয়া কষ্টকর। শিলং, সিমলা, উটাকামণ্ড, হরিদ্বার, কাশ্মীর, বিন্ধ্যাচল, নৈনীতাল, আলমোরা, মুশৌরী, দেরাদূন, কাসৌলী, কুনুর, খাণ্ডালা, ধরমপুর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর হইলেও দূরবর্ত্তী। রাঁচী, হাজারীবাগ, পুরুলিয়া, ঘাটশিলা, চক্রধরপুর, ডেরহী-অন-শোন, কাটরাস-গড়, ধানবাদ, বেনারস, চুনার, এলাহাবাদ, কৈলোয়ার, কটক, ভুবনেশ্বর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানও স্বাস্থ্যকর। উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্থানই স্বাস্থ্যকর। ও দেশটা উঁচু ও খট্‌খটে বলিয়া তথাকার জলবায়ু ভাল। আমাদের বাঙ্গালার মত যে সব স্থান স্যাঁৎসেতে ও নীচু এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়েই জলে ডুবিয়া থাকে, সেই সব স্থানই ব্যাধির আবাসভূমি। তথাপি এই বাঙ্গালাদেশ একদিন স্বাস্থ্যে ও সম্পদে অতুলনীয় ছিল। আজ আমাদের অবহেলায় কি দুর্গতিই না হইয়াছে! আজও দু'চারটি স্থান কতকটা ভাল আছে। ইহার মধ্যে ডায়মণ্ড-হারবার, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ভৈরব, ফুলছরি এবং পদ্মা ও যমুনার তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। সকলের সকল স্থান সহ্য হয় না,—সব সময়ে সকল স্থান ভালও নহে। রোগীর দেহের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা প্রয়োজন। চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া স্থান নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য।

কিছুদিন পূর্ব্বে স্যানাটোরিয়াম্ (Sanatorium) চিকিৎসার একটা ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। স্যানাটোরিয়ামে না গেলে ক্ষয়

রোগের চিকিৎসাই যেন অঙ্গহীন থাকিয়া যাইত। ইউরোপ দেশটা বড়ই হুজুগে, একবার যদি কিছু একটা নূতন কথা উঠে, অমনি সমস্ত লোক সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। স্যানাটোরিয়াম্ চিকিৎসা সম্বন্ধে বোধ হয় সকলেরই অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে। প্রধানতঃ কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে, যেখানে নির্ম্মল আলোক ও বায়ু পাওয়া যায়, তথায় স্যানাটোরিয়ামের স্থান নির্ব্বাচিত হয়। তথায় প্রায় সর্ব্বদাই বাহিরে উন্মুক্ত বায়ুতে থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলো পাওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা করা হয়; এবং উহাতেই রোগ নিরাকৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রোগীকে স্যানাটোরিয়ামে একজন সুচিকিৎসকের অধীনে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়। কিন্তু ইহা হইতে যতটা ফল আশা করা গিয়াছিল, ততটা ফল পাওয়া যায় নাই। বাস্তবিক স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসার যে উপকারিতা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহাতে বায়ুপরিবর্ত্তন ত হয়ই, তাহার উপরে সুদক্ষ ও বিশেষভাবে এই রোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া জীবনটাকে নিয়মিত করা হয়। সুতরাং ভাল ডাক্তার, ভাল স্থান ও সুনিয়ম এই তিনটি জিনিষেরই ফলভোগ হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় উপকার না হইবার কোন কারণই নাই। বহুলোক এই সব স্যানাটোরিয়ামে আসিয়া রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তবে সকল অবস্থার রোগীরই উপকার হয় না। যাহারা প্রথম অবস্থায় আইসে, তাহাদেরই বিশেষ

স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা

উপকার হয়, এই স্যানাটোরিয়ামে থাকিলে আর একটি এই উপকার হয় যে, ব্যাধি সম্বন্ধে রোগীদের বিশেষ জ্ঞান জন্মে এবং যে সব সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা সহজে শিক্ষা করিতে পারে। কাজেই উহারা লোকশিক্ষার সহায়তা করে এবং নিজেদের জীবনও চিরদিনের মত নিয়মিত করিতে পারে। স্যানাটোরিয়ামে যতদিন থাকে, অধিকাংশ রোগীই বেশ থাকে। ফিরিয়া আসিয়া কতক রোগী বেশ সুস্থ থাকে, কিন্তু অনেকেরই পুনরায় ব্যাধি বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে—কেবল স্যানাটোরিয়ামে থাকিতে উহারা ভাল স্থানে বাস করিত, ভাল খাইতে পাইত; কিন্তু বাটী ফিরিয়া হয়ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হইল, আলো ও বায়ুর সুবন্দোবস্ত হইল না, আহারও হয়ত সেরূপ জোগাইয়া উঠিতে পারিল না; সুতরাং এমত অবস্থায় ব্যাধির প্রকোপ যে পুনরায় বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দেশের চিন্তাশীল নেতৃবর্গের এই সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং যাহাতে এই সব লোক ফিরিয়া আসিয়া ভাল ভাবে থাকিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। মিউনিসিপালিটি এবং গবর্ণমেণ্টেরও এই সব লোকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাড়ীর বন্দোবস্ত করা উচিত। যাহাতে উহারা তাহাদের পুরাতন বাটীর ভাড়াতেই এই সব স্বাস্থ্যকর ভাল বাড়ী পাইতে পারে, তাহা করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের ধনকুবেরগণের সহায়তা একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের অপেক্ষা কম সৌভাগ্যবান্ দরিদ্র ভ্রাতাভগিনীদের ও

দেশের কি উপকারই না করিতে পারেন! আমাদের এই পর-দুঃখকাতর দেশে দয়ার্দ্র লোকের কি এতই অভাব হইয়াছে?

স্যানাটোরিয়াম্ বা বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রধান অসুবিধা এই যে, রোগীকে একেবারে কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য দূরদেশে যাইতে হয়; কেন না, কতদিনে যে শরীর ভাল হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু এ বিষয়ে একটী প্রধান অসুবিধা এই যে, হয়ত ঐ রোগীর উপরই সংসারের সমস্ত নির্ভর করে। কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেলে বহুলোক অন্নাভাবে মারা পড়িবে! এ অবস্থায় যাহাতে উহারা নিশ্চিন্ত মনে চিকিৎসার জন্য যাইতে পারে, সে জন্য উহাদিগের পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্ট ও দেশের জনসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য।

যে সব উপায়ে লোকশিক্ষার সহায়তা হইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই একযোগে কাজ করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসকগণ ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রচার করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন।

লোকশিক্ষা

গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে এই ব্যাধির জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসাগার খুলিয়া, এই ব্যাধি সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যপূর্ণ বিবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি বিতরণপূর্ব্বক শিক্ষা বিস্তার করিয়া, দরিদ্রেরা যাহাতে অল্প ভাড়ায় অপেক্ষাকৃত ভাল ঘরে বাস করিতে পারে এবং এই চিকিৎসা যাহাতে লোকের

গবর্ণমেণ্ট

সহজসাধ্য হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া ইহার প্রকোপ ও প্রসার কমাইতে পারেন। এই ধরুন, রোগীর থুতুটা যদি বিনা পয়সায় পরীক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তবে দেশের একটা মহা উপকার হইতে পারে। থুতু একবার পরীক্ষা করাইতে গেলেই ৫৲ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। ক্ষয়রোগে এমনও দেখা গিয়াছে যে, ২০।২৫ বার পরীক্ষার পরে তবে হয় ত থুতুতে জীবাণু দেখা গিয়াছে। এই দীন দরিদ্র দেশের লোকের এমন কি অবস্থা যে, ১০০। ১২৫৲ টাকা খরচ করিয়া ২০।২৫ বার থুতু পরীক্ষা করাইতে পারে? অনেকের একবার ডাক্তার দেখাইবার অর্থই জোটে না। যদি বা ডাক্তার দেখান হইল, অনেক সময় ঔষধ আনিবার পয়সা জুটিয়া উঠে না! বিনা ব্যয়ে থুতু পরীক্ষা আকাশ-কুসুমের কথা নহে। আজকাল ইউরোপের প্রায় সমস্ত বড় বড় সহরেই, এমন কি অনেক ছোট সহরেও ইহা নিত্য হইতেছে। এই জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয়েরও প্রয়োজন।

এই সব কার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। একা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা হইবার নহে। দেশের দীনদুঃখকাতর দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে লক্ষ্মীর যাঁহারা বরপুত্র, তাঁহাদের এবং জনসাধারণেরও এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে।

অর্থ

ভাই কমলার সন্তানগণ! তোমরা যে ইহা দ্বারা কেবল দরিদ্রেরই উপকার করিবে, তাহা নহে। দরিদ্রকে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া নিজ নিজ জীবন রক্ষারই উপায়

বিধান করিবে। সংসারে থাকিতে গেলে একের ভালমন্দ অপরকে পায়। তাই নিজের শুভ আকাঙ্ক্ষা করিতে হইলে অপরের মন্দটা দূর করিতে হইবে। দরিদ্রের ব্যাধি যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে সংক্রমণের ভয়ও কমিবে। সুতরাং ঈশ্বরানুগ্রহে যাঁহারা কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহাদের এ বিষয়ে মুক্তহস্তে সাহায্য করা উচিত।

সমিতি গঠন

ইউরোপে অনেক স্থানে জনসাধারণ মিলিয়া সমিতি গঠন-পূর্ব্বক এই ব্যাধি নিবারণের চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা সংবাদ পাইলেই যেখানে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন, তথায় অর্থদান করে; যেখানে চিকিৎসকের অভাব, তথায় চিকিৎসক পাঠায়; যেখানে শুশ্রূষাকারিণীর দরকার, সেখানে তাহাদিগকে নিয়োগ করে। কেমন করিয়া বাস করিতে হইবে, কোথায় থুতু ফেলিতে হইবে, কি করিলে শরীর ভাল হইবে, কিসে অন্য লোকের অনিষ্ট না ঘটিতে পারে, এ সকল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে বহু লোক রোগমুক্ত হইয়া নিত্যই জাতির বল বৃদ্ধি করিতেছে। ভাই সব! আমাদের দেশে কি এই সব সমিতি-গঠন ও উক্তরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন একেবারেই অসম্ভব? আজ দেশে ব্যাধির তাড়নায় ঘরে ঘরে যে হাহাকার উঠিতেছে, তাহার কি প্রতিকার হইবে না? আমরা কি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিয়া ও মাত্র গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া দিন দিন কেবল ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইব?

যাঁহারা এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এক সময় না এক সময় এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হই, তাই বলিয়া কি সকলেই মরিয়া যাই? আমাদের শরীরের অনেক ক্ষমতা আছে; প্রকৃতিই তাহাকে রোগ নিবারণের স্বাভাবিক বহু ক্ষমতা দিয়াছেন। আমরা যদি সাবধানতার সহিত চলি, যদি এই ব্যাধি দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি, তাহা হইলে নীরোগ হইতে বেশীক্ষণ লাগে না। আমি বহু ব্যক্তিকে এই রোগ হইতে মুক্ত হইতে দেখিয়াছি। এমন কি, যে সকল রোগীর জীবনের আশা মাত্র করি নাই, তাহাদের মধ্যেও অনেকে এমন আরোগ্য হইয়াছেন যে, একেবারে আশ্চর্যান্বিত হইতে হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যাধি আক্রমণ করিলেই জীবনে নিরাশ হইবার কারণ নাই।

আশার কথা

এই ব্যাধিগ্রস্ত হইলে আমাদের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। নিজের জীবন নিজের নিকট যেমন অতিশয় প্রিয়, অন্যেরও সেইরূপ। আমরা যাহাতে অন্যকে সংক্রমিত না করি, সে বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। যাহাতে ব্যাধিগ্রস্তের সহিত একত্রে আহার-বিহার না করি, একত্রে নিদ্রা না যাই, এক পাত্র হইতে পানীয় পান না করি বা একই থালায় না খাই, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। ব্যাধিগ্রস্তের ব্যবহারের জন্য সকল জিনিসই স্বতন্ত্র থাকা উচিত। এক হুঁকায় তামাক খাওয়া অসঙ্গত। অপরকে

আমাদের কর্ত্তব্য

চুম্বন, বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগকে চুম্বন করা একান্তই দোষের, যেহেতু উহারা অতি অল্পেই সংক্রমিত হয়। সর্ব্বোপরি, যেখানে সেখানে থুতু ফেলা অনুচিত। এই সকল নিয়ম পালন দ্বারা যে কেবল সাধারণের উপকার করা হইবে, তাহা নহে, নিজের অভ্যাসও ফিরিয়া যাইবে এবং উহাতে পরোক্ষভাবে নিজেরও প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। অনেকের থুতু গিলিবার অভ্যাস আছে, উহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ঐ জীবাণুপূর্ণ থুতু খাদ্যপথে যাইয়া নানা স্থানে নীত হইতে পারে এবং সেই সব স্থানের ক্ষয় উৎপাদন করিয়া তথা হইতে পুনরায় ফুস্‌ফুস্‌কে আক্রমণ করিতে পারে। সুতরাং এ বিষয়েও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

এই সব বিষয়ে ম্রিয়মান হইবার কিছুই নাই। ব্যাধি হইলে লোকের মনে স্বতঃই কষ্ট হয়। তাহার উপর এইরূপ কঠিন ব্যাধি হইলে আরও বেশী কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তাই বলিয়াই কি হা'ল ছাড়িয়া দিতে হইবে? সমস্ত কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে হইবে? যে ভারতবর্ষ পরের উপকারের জন্য আত্মবিসর্জ্জন চিরদিন শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, সেখানে কি এ সামান্য বিষয় এতই কঠিন? কখনই না। আমার বিশ্বাস, সকলেই প্রফুল্ল চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন এবং যাহাতে অপরে এই দুষ্ট ব্যাধিতে আক্রান্ত না হইতে পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

যখনই বিশেষ কারণ ব্যতীত শরীর খারাপ বোধ হইবে—

সতর্ক হইবার লক্ষণসমূহ

হয়ত উহাতে ভয়ের কোন কারণই নাই, বৈকালে হয় ত একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল, কিংবা প্রথমেই সর্দ্দি হইতে আরম্ভ হইল,—কিংবা খুশখুশে কাশি দেখা দিল, আবার রাত্রিতে অতিরিক্ত ঘাম হইতে লাগিল,—শরীরের নানাস্থানে বিশেষতঃ বুকে পিঠে বেদনা হইতে থাকিল, হঠাৎ গলা দিয়া রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইল, শরীরটা একরূপ অকারণেই দুর্ব্বল হইয়া চলিল, হঠাৎ ক্ষুধাটা বা কমিয়া গেল, হয় ত বা শরীরের ওজন বিনা কারণে কমিতে আরম্ভ হইল, বিশেষ জ্বর নাই বা অন্য কোন উপসর্গ নাই অথচ শরীর-টার স্বস্তি বোধ হইতেছে না—এই সবের কোন একটা মাত্র লক্ষণ যদিও কঠিন নয় বা উহাতে ভয়ের আদৌ কোন কারণ নাই, কিন্তু তবুও খুব একটা অসুবিধা ত ? শারীরিক অসুস্থতা বোধ করিতে হইতেছে ত ? এমত অবস্থায় বৃথা কালক্ষেপ বা উপেক্ষা না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ডাক্তারদের কথা

আমাদের দেশে এই ব্যাধি নিরূপণ সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ দেখিতে পাই। ইহার বিস্তার বন্ধ করিতে হইলে এবং চিকিৎ-সার ফল প্রত্যাশা করিতে হইলে, এই ব্যাধির সূত্রপাতেই ইহাকে ধরিতে হইবে। কিন্তু যত বিপদ্ এখানেই! প্রায়শঃই প্রথমাবস্থায় এ সম্বন্ধে একটা মত দিতে অনেকেই ইতস্ততঃ করেন। থুতুতে জীবাণু বা ফুস্ফুসে ক্রেপিটেশন্ (Crepitation) প্রভৃতি না পাইলে এই রোগ সম্বন্ধে

ডাক্তারেরা কোন মত দেন না। ঐ সকল লক্ষণ যখন পাওয়া যায়, ব্যাধি তখন বহুদূর অগ্রসর হইয়া থাকে এবং তাহার প্রতিকারও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় যাহাতে একটা মতামত দেওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কোন ডাক্তার যদি বলেন, "হাঁ, ব্যাধি সন্দেহ হইতেছে," অপরে হয় ত বলিয়া বসেন—"না, এ সম্বন্ধে এখনও কিছুই ঠিক বলা যায় না।" ইহা যে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। একেবারে প্রথম অবস্থায় ইহা ধরা যায় না সত্য, তবে কিছু দিন পরই এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়, যাহা হইতে একেবারে নিশ্চয়রূপে বলিতে না পারিলেও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকে। রোগী শিক্ষিত হইলে সন্দেহ হওয়া মাত্রই তাঁহাকে নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হইতে বলা সঙ্গত এবং তাঁহাকে যে মাঝে মাঝে দেখা আবশ্যক, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বার বার দেখিলে হয় ত সন্দেহের কারণ দূরীভূত হইবে, নতুবা যাহা সন্দেহের বিষয় ছিল, তাহা ব্যাধিরূপে নিশ্চিত প্রকাশ পাইবে। মানবজীবন বড়ই মূল্যবান্। উহা যাহাতে আমাদের অবহেলায়, আমাদের মূর্খতায়, আমাদের একগুঁয়েমীতে নষ্ট না হয়, তাহার যথোচিত চেষ্টা করা উচিত। আমরা হয় ত সব সময় সকল কথা বুঝি না। মানুষ সদাই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। এমত অবস্থায় অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ একজনের মাথার চেয়ে যে দুইজনের মাথার মূল্য বেশী, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যক্ষ্মা রোগে কয়েকটি বিশেষ উপসর্গের সহজ প্রতিকারোপায় বা গৃহ-চিকিৎসা

সাধারণ কথা

যক্ষ্মা রোগে ধরিলে অধিকাংশের পক্ষেই উহা একটী জীবনব্যাপী সংগ্রাম হইয়া দাঁড়ায়; জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য কোমরে কাপড় বাঁধিতে হয়, ব্যাধির সহিত অহোরাত্র হাতাহাতি করিয়া উহাকে নিরস্ত রাখিতে হয়। সাপের মাথার উপর যতক্ষণ পা থাকে ততক্ষণ উহার ফোঁস্‌ফোসানি পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে; কিন্তু পা-টি কোনক্রমে আল্‌গা পাইলেই ফোঁস্‌ফোসানি চুলায় যাউক, একেবারে দাঁত ফুটাইয়া দেয়। সুতরাং এই ব্যাধিতে আক্রমণ করিলেই উহার গলায় পা দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, উহা কোন প্রকারে বাগ পাইলেই শত্রুতাসাধন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। এইজন্য উহাকে কোনরূপ সুযোগ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলেই এই ব্যাধির প্রকৃতি, খুটি-নাটি, সামান্য-বৃহৎ সমস্ত বিষয়ই জানা আবশ্যক। জানা শত্রুর সঙ্গে তবু লড়াই করা চলে, অজ্ঞাত শত্রু

হইলে কোথা হইতে যে শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া জীবনপাত করিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

সেই জন্য এই ব্যাধি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জ্জন আবশ্যক। ইহার সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে, কিরূপে উহা আক্রমণ করে, কিরূপেই বা ঐ আক্রমণ নিবারণ করা যায়, সে সম্বন্ধে পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। উহার চিকিৎসাদি বিষয়ে উহাতে কিছুই বলা হয় নাই, বলা আবশ্যকও মনে করি নাই। চিকিৎসা বিষয়টি বিশেষজ্ঞদেরই শোভা পায়। যাঁহারা এ বিষয়ে রীতিমত অনুশীলন করিয়াছেন, পুস্তকাদি পাঠে এ বিষয়ের জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছেন, যে সব বিষয় হাতে-কলমে শিখিতে হয়, তদ্রূপ শিক্ষা করিয়াছেন, অভোধিক পর্য্যবেক্ষণক্ষম, জ্ঞানবৃদ্ধ, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট উপদেশ পাইয়াছেন ও নানারূপ রোগী দেখিয়া বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তিদেরই চিকিৎসার ভার লওয়া শোভা পায়। সুতরাং ব্যাধি হইলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ও তাঁহার উপদেশ লওয়া সঙ্গত। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া পড়ে, যখন চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করিলে চলে না। বড় বড় সহরে না হয় প্রতি রাস্তায় ৪।৫ গণ্ডা করিয়া ডাক্তার আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকেই কি সব সময় পাওয়া যায়? বাটীর নিকটস্থ ডাক্তারই যে গৃহ-চিকিৎসক হইবেন, এমন কোন কথা নাই। সকল ডাক্তারের উপর সমান শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকা অসম্ভব নহে। মনে করুন, আপনার গৃহ-চিকিৎসকের বাটী প্রায় এক মাইল দূরে, এমত

অবস্থায় রোগীর কোনরূপ গুরুতর লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেও সময়ের প্রয়োজন। হয় ত সব সময় তাঁহাকে পাওয়া না-ও যাইতে পারে। সুতরাং আজকালকার মোটর-টেলিফোনের দিনেও সকল সময় ইচ্ছানুরূপ ডাক্তার মিলিয়া উঠে না। সহরে না হয় যেখান সেখান হইতে একজনকে ধরিয়া আনিয়া জোড়াতালির কাজ চালাইয়া দিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাও সব সময়ে ঘটিয়া সে উঠে না, এরূপ আমরা অনেকবার দেখিয়াছি। পাড়াগাঁয়ের কথা আর কি বলিব? তথায় স্থানে স্থানে ৮।১০ মাইল, এমন কি, ২০।৩০ মাইলের মধ্যেও ভাল ডাক্তার নাই। সহরে বসিয়া ইহা আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার এক বর্ণও অসত্য নহে! সে সব স্থানে হঠাৎ রোগীর অবস্থা গুরুতর হইলে এবং নিজেদের দ্বারা কোন প্রতিকার না হইতে পারিলে, ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রোগীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অবস্থাবিশেষে সাধারণে যাহাতে সতর্ক হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যক্ষ্মা ব্যাধিতে যে সব সঙ্কট ও সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে, আমরা এই অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা করিব এবং সাধারণ গৃহস্থ তাহার কি প্রতিকার করিতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রবল জ্বরে (High fever)

যক্ষ্মা রোগে জ্বর একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বরের পরিমাণের

কোন স্থির হিসাব নাই, কখনও বেশী, কখনও কম হয়। সময় সময় জ্বর খুব বেশী হইয়া পড়ে। শরীরে যক্ষ্মা-বিষের মাত্রা বেশী অথবা অন্যবিধ বিষ (Secondary infection) প্রবেশ করিলে, প্রায় ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। ১০২°—১০৩° পর্য্যন্ত জ্বরে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ থাকে না। ১০৩° এর উপরে উঠিলেই সতর্ক হইতে হয়, এবং ১০৪°এর উপরে উঠিলেই ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ১০৫°—১০৫৷৷° জ্বরে অনেক সময় ফিট্ বা জ্বর-চমক বা তড়কা (Fits) হইয়া পড়ে এবং নানারূপ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং জ্বর বৃদ্ধি হইবার সময় হইতেই সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। জ্বর ১০২°—১০৩° হইলেই মাথার সম্মুখে কপালে ঠাণ্ডা জলের পটী দেওয়া আবশ্যক। জলের সঙ্গে বরফ মিশাইলে আরও ঠাণ্ডা হয়। অনেক সময় অডিকোলন (Eu-de-Cologne) বা ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার (Lavender Water) জলের সহিত মিশাইয়া মাথায় পটী দিলে বেশ আরাম লাগে। এই সব জলে স্পিরিটের (Spirit) ভাগ থাকায় স্পিরিট উড়িয়া যাওয়ার সময় (Evaporation) গরমটা উঠিয়া যায় ও মাথা বেশ ঠাণ্ডা লাগে। এই সময় হাত-পাখা লইয়া মাথায় একটু একটু বাতাস দিলে বেশ ভাল বোধ হয়।

যাহাদের সর্ব্বদা ইলেট্রিক্ পাখার (Electric Fan) নীচে থাকা অভ্যাস, তাহাদের গায়ে বেশ করিয়া কাপড় দিয়া, রেগুলেটারের (Regulator) ২।১ পয়েন্ট (Point) খুলিয়া দিলেই যথেষ্ট; কিন্তু উহা অপেক্ষা হাত-পাখাই ভাল। জলপটিতে

যদি জ্বর না কমে বা রোগী ভাল বোধ না করে, তবে আইস্-ব্যাগে (Ice-bag) করিয়া মাথায় বরফ দেওয়া যাইতে পারে। উহাতে অধিকাংশ সময়েই আরাম পাওয়া যায় এবং প্রায়শঃই জ্বরের তাপ কমিয়া আইসে। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা আইস্-ব্যাগ দেওয়াতেও যদি জ্বর না নামে, কিংবা উহা সত্বেও যদি জ্বর বাড়িয়া যাইতে থাকে, তবে জল দ্বারা গা মুছাইয়া দেওয়া (Sponging) উচিত। এই গা-মুছান সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ গরম জলের ভিতর স্পঞ্জ (Sponge) বা ছোট তোয়ালে বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা ডুবাইয়া, উহা নিংড়াইয়া লইয়া উহা দ্বারা গা মুছাইয়া দিতে হয়। ইহাতে এই ফল হয় যে, শরীরটা বেশ পরিষ্কার হয়, লোমকূপের ছিদ্রসমূহের মুখগুলি খুলিয়া যায় ও তাপ লাগার দরুন উপরিস্থিত রক্তবাহী শিরাসমূহ প্রসারিত হওয়াতে ভালরূপে রক্ত সঞ্চালন হয় এবং ঘাম হইয়া শরীরের উত্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। ইহার গুণ এই যে, ইহাতে ঠাণ্ডা লাগার বেশী ভয় থাকে না। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহাতে জ্বর বড় একটা বেশী নামে না। তখন বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন করিতে হয়, অর্থাৎ ঠাণ্ডা জল দ্বারা গা মুছানই দরকার হইয়া পড়ে। সামান্য একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলে ইহাতেও ঠাণ্ডা লাগার কোন ভয় নাই। স্পঞ্জ করার সময় সমস্ত কাচের শার্সী বন্ধ করিতে হইবে। যদি শার্সী না থাকে, তবে কাঠের দরজাগুলিই বন্ধ করিতে হইবে। অবশ্য সব সময়েই যে উহা প্রয়োজন, তাহা নহে। খুব গ্রীষ্মের সময় উহা বন্ধ না করিলেও চলে। তবে

ডাক্তার কাছে না থাকিলে একটু বেশী সাবধান হওয়াই সঙ্গত। ঈষদুষ্ণ জল হইতে আরম্ভ করিয়া রীতিমত কলের জল (Tap water) বা কূপের জল, পুকুর বা নদীর, সকল জলই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এ সময় পাখাদি একেবারে বন্ধ থাকিবে। দরকার হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই স্পঞ্জিং করার সময় শরীর জল দ্বারা রীতিমত ভিজাইয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ ঠাণ্ডা জলে গা মুছাইয়া দিলেই জ্বর নামিয়া আইসে, কিন্তু সময় সময় ৫।১০ মিনিট, এমন কি, ১৫।২০ মিনিটও ঠাণ্ডা জল দ্বারা মুছাইয়া দিতে হয়। থারমোমিটারে যে পর্য্যন্ত তাপ নামিতে না দেখা যায়, সে পর্য্যন্ত স্পঞ্জিং বন্ধ করা হয় না। সাধারণতঃ জ্বর ১০২°—১০১° পর্য্যন্ত নামিয়া আসিলেই উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া সঙ্গত। কারণ, স্পঞ্জিং বন্ধ করিলেও উহার ক্রিয়া কিছুকাল চলিতে থাকে এবং উহার পরেও তাপ এক আধ ডিগ্রী কমে। তাপ বেশী কমিয়া হঠাৎ হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া রোগীর অবসাদ (collapse) আসিতে পারে। সুতরাং তাপ যাহাতে বেশী নামিয়া না পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। এই স্পঞ্জ করার জলের সহিত টয়লেট্ ভিনিগার, (Toilet Vinegar) অডিকোলন বা ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার প্রভৃতি অল্প পরিমাণে মিশাইয়া দিলে শরীরটায় বেশ স্ফূর্ত্তি ও স্বস্তি বোধ হয়। স্পঞ্জিংএর সময় মাথায় আইস্-ব্যাগ্ রাখিলে ভাল হয়; নতুবা ঠাণ্ডা জল দ্বারা মাথাটা বেশ

করিয়া ধোয়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতেও জ্বর না কমিলে জলের টবে রোগীর গলা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর ডুবাইয়া ক্রমাগত জলের তাপ কমাইলে দেহের তাপও কমে। অথবা রোগীকে ভিজা কাপড়ে কিছুকাল জড়াইয়া রাখিলে এবং যে পর্য্যন্ত তাপ না কমে, সে পর্য্যন্ত উহার উপর জল ছিটাইয়া দিলে তাপ ক্রমশঃই কমিয়া আইসে। উহাতে কৃতকার্য্য না হইলে রোগীর চারিদিকে বরফ দিলে তাপ দ্রুত কমিয়া যায়। শেষোক্ত দুইটী প্রক্রিয়া ডাক্তার ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা করা উচিত নহে; আমি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র। মফস্বলে অনেক স্থানে বরফ পাওয়া যায় না। সে সব স্থানে জলপটী প্রভৃতিতে উপকার না দেখিলে স্পঞ্জিং করার পূর্ব্বে মাথাটা বেশ কয়েক ঘটা জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয় ও জ্বর নামিয়া আইসে। মফস্বলে রোগীর মাথায় অনেক সময়ে কলসী কলসী জল ঢালিতে হয়, উহাতে ভয়ের কোন কারণই নাই। একটি ডুশ জলে পূর্ণ করিয়া মাথার কাছে সুবিধামত টাঙ্গাইয়া নলমুখে অল্প অল্প জল অনবরত মাথায় দিতে থাকিলে অনেক সময় জ্বর কমে।

নিশাদল (Ammon chloride) ও সোরা (Nitre) একত্রে মিশাইলে খুব ঠাণ্ডা হয়, উহা বরফের পরিবর্ত্তে ব্যাগে করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে; তবে উহার দোষ এই যে, উহা রবারকে সত্বরে নষ্ট করিয়া দেয় এবং আইস্-ব্যাগটি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহা বরফের অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য এবং বরফের

মত শীতলও নহে। তবে উহা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং ঠেকা কাজ চলিয়া যাইতে পারে।

আইস্-ব্যাগও মফস্বলে সব সময়ে পাওয়া যায় না। শুপারী গাছের পত্র-আবরণ সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। উহার ভিতরের দিকে একটী পাতলা আবরণ থাকে। বহিরংশ হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারিলে উহার ভিতরে করিয়া বরফ দেওয়া যাইতে পারে। কেন না, উহার ভিতর দিয়া সহসা জল নির্গত হয় না।

আইস্-ব্যাগ কতক্ষণ মাথায় রাখা যাইতে পারে, মাথার কোন্ দিকে কি ভাবে দিতে হয়, তাহার সম্যক্ জ্ঞানও সকলের নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধেও এই স্থানে দু'চারিটি কথা বলা অসঙ্গত মনে করি না। সাধারণতঃ একযোগে আইস্-ব্যাগ দুই ঘণ্টার বেশী না দেওয়াই কর্ত্তব্য। দুই ঘণ্টা দিয়া পুনরায় আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা বাদ দিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা চলিতে পারে। এ সব সম্বন্ধে ডাক্তারের উপদেশমত চলিতে হইবে; কারণ, প্রত্যেক রোগীরই অবস্থাবিশেষে স্বতন্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন। ডাক্তার অনুপস্থিতির সময় কি করা দরকার, আমরা তাহাই বলিতেছি মাত্র। সুতরাং আইস্-ব্যাগ মাথায় দিয়া পাঁচ মিনিট পরেই নামাইবার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আইস্-ব্যাগ প্রধানতঃ মস্তকের সম্মুখের ভাগে দিতে হয়। আমাদের মস্তকের কার্য্যকরী শক্তির স্থান, বিশেষতঃ তাপ উৎপাদনের কেন্দ্র (Heat producing centre) এই জায়গায়। কাজেই ঐ স্থানে প্রয়োগই প্রধান দরকার, তবে মস্তকের সমস্ত স্থানেই

দেওয়া যাইতে পারে। মাথায় বেশী চুল থাকিলে আইস্-ব্যাগ দেওয়ার পক্ষে অসুবিধা হয়। যাহাতে মাথার চামড়ার সহিত ব্যাগ লাগিতে পারে, তাহার জন্য মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; মাথা একেবারে মুড়াইয়া দিলে আরও ভাল হয়; তবে মেয়েদের বেলায় এ বিষয়ে সাবধানে অগ্রসর হওয়া উচিত; কেশ রমণীর একটী প্রধান সৌন্দর্য্য; একান্ত আবশ্যক না হইলে উহার উচ্ছেদ কখনই সঙ্গত নহে। সময় সময় রোগী মাথায় আইস্-ব্যাগ রাখিতে আদৌ ভালবাসে না—নেহাৎ বিরক্ত মনে করে। সেরূপ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যবস্থা করাই সঙ্গত; রোগীকে আরাম দেওয়াই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া যাহাতে সে বিরক্ত হয়, সেরূপ কাজ সহসা এবং একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলে কিছুতেই করা সঙ্গত নহে। এরূপ স্থলে জল দিয়া মাথা ধোয়াইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। স্পঞ্জ দেওয়ার পরমুহূর্ত্তেই ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। উহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া নানাবিধ উপসর্গ আসিতে পারে। রোগীর শরীর বেশ করিয়া মুছাইয়া ও কাপড় ঢাকা দিয়া তবে দরজা জানালা খোলা উচিত। কিছু কালের জন্য একটা হাল্কা কম্বল দিয়া রোগীকে ঢাকিয়া দেওয়া ভাল।

এই জ্বর বৃদ্ধির সময় রোগী অনেক সময় পিপাসায় কাতর হয় ও একটু জল বা এক টুকরা বরফের জন্য অস্থির হয়; নিকটস্থ ব্যক্তিগণ উহা দিতে প্রায়ই ঘোর আপত্তি করেন; পিপাসার সময় একটু জল বা ছোট এক খণ্ড বরফ দিলে কোনই

ভয় বা দোষের কারণ নাই, বরং জ্বর ত্যাগ বিষয়ে সহায়তা করে। আবশ্যকমত অল্প পরিমাণে সোডা-ওয়াটার বা লিমনেড দেওয়াও চলে। ফিট বা জ্বর চমকের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা নানা প্রকারে হইতে পারে। সে কথার আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথার অবতারণা করিতে হয়। সুতরাং ঐ সময়ে কি কি বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক, কেবল মাত্র তাহারই উল্লেখ করিব। জ্বর-চমক (তড়কা) সাধারণতঃ বালক বালিকাদেরই বেশী হইতে দেখা যায়। ঐরূপ হইলে তৎক্ষণাৎ মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিবে ও পাখার হাওয়া করিতে থাকিবে। রোগীকে বেশী নাড়া চাড়া করিবে না। গলায় জামার বোতাম আটকান থাকিলে উহা খুলিয়া দিবে। সম্ভবতঃ ইহাতেই জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে।

জ্বরত্যাগকালীন অবসাদ (Collapse)

যেমন জ্বর বৃদ্ধির সময় ভয়ের কারণ আছে, সেইরূপ জ্বর-ত্যাগের সময়ও তাপ ৯৭° নীচে হইলেই আশঙ্কার কথা। সেরূপ হইলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে খবর দিবে। যদি হাত পা ঠাণ্ডা লাগে ও তাপ কমের দিকে যাইতে থাকে, তখন ডাক্তারের জন্য বসিয়া না থাকিয়া ফ্ল্যানেল গরম করিয়া রোগীর হাত পা বেশ করিয়া সেঁকিবে।

রোগীর শরীরটা বেশ করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। বোতলে গরম জল পূরিয়া উহা কাপড় দিয়া জড়াইয়া দুই পায়ের ভিতরে ও বাহিরে রাখিয়া পা ঢাকিয়া দিবে। এইরূপ হাতের

দু-পাশেও গরম জলের বোতল রাখিবে। বোতলের পরিবর্ত্তে রবারের ব্যাগেও (Hot-water bag) গরম জল ভরিয়া রাখা যাইতে পারে। বোতলগুলির তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা চাই, যেন ফাটিয়া না যায়। সাধারণতঃ মদের বোতল বা স্পিরিটের বোতল বা ডিস্‌টিল্ড ওয়াটারের (Distilled water) বোতলগুলিই ভাল। গরম জল পূরিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে,—যখন বোতল গরম হইয়া উঠিবে, তখনও যদি না ফাটে, তবে বুঝা গেল, সম্ভবতঃ আর ফাটিবার আশঙ্কা নাই। বোতলের কাগ (cork) যাহাতে ভাল করিয়া বন্ধ হয় এবং খুলিয়া গরম জলে গা পুড়িয়া না যায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ একই কারণে বোতলটি কাপড় বা ফ্ল্যানেল দ্বারা জড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে এই সামান্য বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করাতে রোগীর গায়ে ফোস্কা প্রভৃতি পড়িতে দেখা গিয়াছে।

যদি বেশী ঠাণ্ডা বোধ হয়, তবে হাত পা ও শরীরের অন্যান্য স্থানে শুঁঠের গুঁড়া (Pulv Ginger) বেশ করিয়া রগড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঘরে ব্রাণ্ডী (Brandy) থাকিলে উহার ৬০।৭০ ফোঁটা আধ ছটাক জলের সহিত মিলাইয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। মৃগনাভি ২ রতি ও মকরধ্বজ ১ রতি মধু বা বেদানার রস সহ মাড়িয়া খাওয়াইতে পারা যায়। মৃগনাভি না থাকিলে শুধু মকরধ্বজই দেওয়া চলে। সময় সময় ২।১ চামচ গরম দুধ অথবা বেদানার রসও দিতে পারা যায়।

গলা দিয়া রক্ত উঠা

যক্ষ্মা রোগে অনেক সময়েই গলা দিয়া রক্ত উঠিতে দেখা যায়। হাসপাতালসমূহে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যক্ষ্মারোগীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০।৭০ জনেরই ব্যাধির কোন না কোন সময়ে গলা দিয়া রক্ত উঠিয়া থাকে। কাহারও বা গলা দিয়া রক্ত উঠিয়াই এই ব্যাধির সূত্রপাত হয়। হয় ত তাহার পূর্ব্বে কোনরূপ অসুখ বোধ হয় নাই, বেশ স্বচ্ছন্দে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ রক্ত উঠাতে ভয়ে অস্থির হইয়া ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া এই ব্যাধি সম্বন্ধে হয় ত সন্দিহান হইলেন, অথবা ব্যাধিতে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। রোগী ত রক্ত দেখিয়াই আতঙ্কে অস্থির হয়। রক্ত যদি ১ ছটাক উঠে, সে মনে করে যে, নিশ্চয়ই এক সের উঠিয়াছে, সমস্ত দেহের রক্তই যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে। রক্ত দেখিলে স্বতঃই সকলেরই ভয় হয়। উহা আমাদের দেহের একান্ত সার পদার্থ। সুতরাং উহার মোক্ষণ দেখিয়া রোগী যে শঙ্কায় কাতর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে রক্ত উঠাতে উপস্থিত ভয়ের বাস্তবিক বেশী কোন কারণ নাই, যেহেতু শুধু রক্তপাতের দরুন ক্ষয়-রোগীকে বড় একটা মরিতে দেখা যায় না। হয় ত শতকরা ২।১ জন মরিয়া থাকে। কাজেই উহার জন্য ভয়ে আধমরা হওয়া কখনই সঙ্গত নহে।

সাধারণতঃ যক্ষ্মা রোগের দুই অবস্থায় রক্ত উঠিয়া থাকে—প্রথমতঃ ব্যাধির প্রথম ভাগে, দ্বিতীয়তঃ শেষের দিকে। প্রথম ভাগের দিকে যে রক্ত উঠে, উহা সাধারণতঃ ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্যের কারণ। আমাদের শরীরের যে কোন স্থানে আঘাত লাগুক না কেন, সেই স্থানেই রক্তাধিক্য ঘটে। দেহের একটা স্থানে যদি সূঁচ বিঁধিয়া যায় বা কোন স্থানে যদি একটা সামান্য ক্ষুদ্র পিপীলিকাও দংশন করে, সেই স্থানই যে লাল হইয়া উঠে, ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শরীরের যে স্থানই কোনরূপে উত্তেজিত (irritated) হয়, সেই স্থানেই রক্তাধিক্য ঘটে। এই রক্তাধিক্য তথাকার আক্রমণকারী শত্রুকে বা দূষিত পদার্থকে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করে এবং সেই স্থানকে পুনরায় স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় আনিতে সহায়তা করে। এইরূপ ফুস্‌ফুসেও। ফুস্‌ফুসে যদি কোনওরূপ আঘাত লাগে বা তথায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষয়জীবাণু বা অপর বীজাণু যাইয়া প্রদাহ (irritation) উৎপাদন করে, তাহা হইলে তথায়ও রক্তাধিক্য ঘটে। এই রক্তাধিক্যের কারণেই রোগের প্রথম অবস্থায় অনেক সময় রক্ত-মোক্ষণ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ীতে (capillaries) রক্তাধিক্য ঘটে, সেখান হইতে রক্ত চুয়াইয়া (by Diapedesis) শ্বাসনালীতে যায়, এবং তথা হইতে কাশির সহিত গলা দিয়া উঠে। সময় সময় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ীগুলি ছিঁড়িয়াও রক্ত মোক্ষণ হয়। প্রথম ভাগে যে রক্ত উঠে, উহা প্রায়শঃই পরিমাণে অল্প—হয় ত

কাশির সহিত মিশ্রিত সামান্য রক্ত। সময় সময় যে বেশীও না উঠে, তাহাও নয়, তবে সাধারণতঃ ৩।৪ আউন্সের বেশী উঠে না।

ব্যাধি অগ্রসর হইলে বা শেষের দিকে যে রক্ত উঠে, উহা প্রায়ই রক্তবহা নাড়ী (artery) ছিঁড়িয়া বাহির হয়। ক্ষয়-জীবাণু ও উহার নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থসকল ক্রমশঃ ফুস্‌ফুসের ক্ষয় সাধন করে। উহার ফলে ফুস্‌ফুসের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত হয় (cavity formation) এবং উহার কার্য্য চলিতে থাকিলে উহা ক্রমে বৃহদায়তনও হয়। ফুস্‌ফুস্ যে পদার্থে তৈয়ারী, তাহা অপেক্ষা রক্তবহা নাড়ীগুলি কঠিন উপাদানে নির্ম্মিত এবং এই কারণে ফুস্‌ফুসের ক্ষয় হইলেও সঙ্গে সঙ্গেই রক্তবহা নাড়ীগুলির ক্ষয় হয় না। ঐ নাড়ীগুলি চারিদিকে খোলা জায়গা পাওয়াতে ও উহাদের উপরকার চাপ কমিয়া যাওয়াতে এবং নিজেদের সাধারণ স্থিতি-স্থাপকতা গুণ থাকা বশতঃ প্রসারিত হয়; বিশেষতঃ ভিতরকার রক্তসঞ্চালনের বেগ যদি কোন কারণে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে আরও সহজে প্রসারিত হয়। এইরূপ ক্রমে প্রসারিত হইতে হইতে উহাদের আবরণগুলি (walls) পাতলা হইয়া পড়ে। ভিতরে কোন কারণে রক্ত চলাচলের জোর বৃদ্ধি হইলেই উহার আবরণ ফাটিয়া যায় এবং শ্বাসনালীর ভিতর রক্ত আসিয়া পড়ে ও তথা হইতে কাশির সহিত গলা দিয়া উঠে। সকল সময়েই যে নাড়ী এইরূপে প্রসারিত হইয়া ফাটিয়া যায়, তাহা নহে। ফুস্‌ফুসের ক্ষয় আরম্ভ

হইলে শেষে অনেক সময় উহা এই নাড়ীও খাইয়া দেয়। নাড়ীর চারি দিক্ খোলা পড়িলে, শরীরে যদি হঠাৎ কোনরূপ আঘাত লাগে কিংবা টান লাগে, তাহা হইলে তাহাতেও ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় সময় সময় বৃহদাকার নাড়ী ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া রক্ত বেশী পরিমাণ উঠে। ২।৩ আউন্স হইতে আরম্ভ করিয়া ২।৩ পাইণ্ট (২০ আউন্স = ১ পাইণ্ট) অর্থাৎ ১॥০ সের, ২ সের পর্য্যন্ত রক্ত উঠে। রক্ত খুব অধিক পরিমাণে উঠিলে সময় সময় ভয়ের সম্ভাবনা আছে। উহা শ্বাসনালীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দম বন্ধ হইয়া প্রাণনাশ করিতে পারে। একেবারে যদি খুব অধিক রক্ত উঠে, তাহা হইলে মস্তিষ্ক রক্তশূন্য হইয়া মূর্চ্ছা রোগে মৃত্যু ঘটিতে পারে। (death by syncope from cerebral anæmia)। তবে উহার সম্ভাবনা খুব কম। পূর্ব্বোক্ত ভাবেই মৃত্যুর আশঙ্কা বেশী, তাহাও শতকরা ২।৩ জনের অধিক যে হইতে দেখা যায় না, সে কথাও ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

গলা দিয়া যে রক্ত উঠে, উহা উজ্জ্বল লালবর্ণ ও ফেনিল (frothy)। উহা যখন অল্প পরিমাণে উঠে, তখন প্রায়শঃই কফের সহিত মিশ্রিত থাকে। সময় সময় রক্ত গলা হইতে পাকস্থলীতে যায় এবং কিছুকাল পরে যখন বমনের সহিত উঠিয়া আইসে, তখন উহার বর্ণ কিছু কাল দেখায়। পাকস্থলীতে বেশী পরিমাণে প্রবেশ করিলে ক্বচিৎ মলের সহিতও নিঃসৃত হয়। উহার বর্ণ তখন কাল।

গলা দিয়া যে রক্ত উঠে, উহার সহিত অনেক সময় ক্ষয়-জীবাণু মিশ্রিত থাকে।

এই রক্ত উঠার কারণ সব সময়ে সবিশেষ নির্দ্দেশ করা যায় না। হঠাৎ কোন জোরের কাজ করিতে যাওয়া, অতিরিক্ত শ্রম বা কোনরূপ মানসিক উত্তেজনা, মলত্যাগের সময় জোরে কোঁথানি দেওয়া, অনবরত কাশিয়া অস্থির হওয়া, ঋতুস্রাব বা কোনও কারণে রক্ত চলাচলের বেগ হঠাৎ বৃদ্ধি হইলে, হঠাৎ অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডার সংস্পর্শে আসিলে বা অত্যধিক মদ্যপান করিলে রক্ত উঠার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অনেক সময় বিনা কারণেও রক্ত উঠিয়া থাকে। হয় ত রোগী বিছানায় শুইয়া আছে, কিংবা সুস্থভাবে আরাম-কেদারায় বসিয়া আছে—হঠাৎ গলাটা একটু শুড় শুড় করিল, বুকটা একটু চাপা চাপা বোধ হইল—পরক্ষণেই গলা দিয়া রক্ত উঠিয়া পড়িল।

গলা দিয়া রক্ত উঠিলেই যে উহা যক্ষ্মাজনিত, এ কথা মনে করা উচিত নহে। নানাবিধ কারণে গলা দিয়া রক্ত উঠিতে পারে। প্রথমেই নাকের ও গলার ভিতর হইতে কোনরূপ রক্ত বাহির হইবার কারণ কিছু পাওয়া যায় কি না, তাহা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। দাঁতের গোড়া হইতেও অনেক সময় রক্ত যাইয়া কাশির সঙ্গে আইসে, উহাও ভাল করিয়া দেখা উচিত। তার পর নানাবিধ হৃদ্‌রোগে, কণ্ঠনালীর ক্যান্সারে (cancer), নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস্ ও লিভারের সিরোসিস্-এ (Cirrhosis of liver) এবং বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি নানাবিধ

রোগে ও রক্ত সম্বন্ধীয় ব্যাধিতেও (Diseases of blood) এইরূপ রক্ত উঠিয়া থাকে। এ সমস্ত বর্জ্জন করিলেও, যদি কোথাও কিছু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সচরাচর উহা ফুস্‌ফুস্‌-জাতই মনে করিতে হইবে। কারণ, যক্ষ্মার প্রথম অবস্থায় প্রায়ঃশই কোন উপসর্গ ধরা যায় না। যখন ফুস্‌ফুসে ব্যাধির লক্ষণ পাওয়া যায়, তখন ত সন্দেহের কারণই থাকে না। রক্তের ভিতর ক্ষয়জীবাণু পাওয়া গেলে উহা যক্ষ্মাজনিত বলিয়া নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব কখন কখনও যে স্বাভাবিক পথে না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে মাসে মাসে গলা দিয়া রক্ত উঠে, এ কথাও মনে রাখা দরকার।

আয়ুর্ব্বেদে রক্তপিত্ত বলিয়া একটা অবস্থার সবিশেষ বিবরণ দেখা যায়। উহাকে কবিরাজগণ যক্ষ্মা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পিত্ত কুপিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে এবং ঐ দূষিত পিত্ত ও রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া কখনও গলা দিয়া, কখনও মলদ্বারপথে, প্রস্রাবের পথে, যোনিদ্বার পথে, কখনও বা লোমকূপপথে বহির্গত হয়। উহা হইতে আমাদের অনুমান হয়, অবস্থাবিশেষে যকৃতের কার্য্য কোন বিশেষভাবে বিকৃত হইলে উহা রক্তের বিশেষ এক পরিবর্ত্তন ঘটায় এবং তখন উহা নানা পথে নির্গত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই পরিবর্ত্তন কি এবং কোন্ উপায়ে ঘটে, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। তবে আশা আছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহার একটা কূলকিনারা হইতে পারে। রক্তের উপর

যকৃতের একটা বিশেষ ক্রীড়া আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এ বিষয়ে সম্যক্ অনুসন্ধান হয় নাই।

যখন গলা দিয়া রক্ত উঠে, তখন রোগীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে দেখায়, শরীর বিবর্ণ ও ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং রোগী ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়। শরীরের তাপ স্বাভাবিক হইতে অনেক নীচে নামিয়া যায়। এই সময়ে রোগীর সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, ডাক্তারের জন্য ত লোক যাইবেই, কিন্তু নিজেদেরও একটু সতর্ক হইতে হইবে। রোগীকে নাড়াচাড়া করিবে না, যেখানে থাকে, সেইখানেই অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রাখিবে। একেবারে শোয়ার চেয়ে পিঠের ও মাথার নীচে বালিস দিয়া আধশোয়া করিয়া দেওয়াই ভাল। যদি ডাক্তার পূর্ব্বে বলিয়া থাকেন, কোন্ দিক হইতে রক্ত উঠিবার আশঙ্কা আছে এবং সেই দিকে শোয়াইয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে রক্তটা যাইয়া ভাল দিকের শ্বাস-নালীর ভিতর প্রবেশ করিয়া শ্বাসকষ্ট করিতে পারিবে না। যদি বেশী রক্তমোক্ষণের জন্য মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিবার জন্য ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। কারণ, এই মূর্চ্ছার দরুন রক্তের জোর কম থাকে এবং উহা রক্ত উঠা বন্ধ করিতে সহায়তা করে। ঘরটা যাহাতে ঠাণ্ডা থাকে ও উহাতে বেশ হাওয়া চলাফেরা করে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঘরে যাহাতে কোনরূপ গোলমাল না হয়, তাহাও করিতে হইবে। ঘরটা বরং একটু অন্ধকার করিয়া রাখিলে ভাল হয়। রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখিতে হইবে। কথা বলা এক রকম

বন্ধ থাকিবে। রোগী কোনরূপ সাংসারিক বা মানসিক চিন্তা করিবে না। রোগী স্ত্রীলোক হইলে, ছেলে-পিলেরা যেন হাঙ্গামা না করিতে পায়। বাটীর মধ্যে কোনরূপ গোলমাল না হয়। ডাক্তারের রোগীর বুক ঠুকিয়া পরীক্ষা বা জোরে জোরে শ্বাস নিতে বলা উচিত নহে। কেবল ষ্টেথেস্কোপটি আস্তে বুকে লাগাইয়া স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের অবস্থা একটু দেখা দরকার। একবার রক্ত উঠিলে পুনঃ পুনঃ উঠার আশঙ্কা থাকে। ২।১ টুক্‌রা ছোট বরফ মাঝে মাঝে খাইতে দেওয়া যায়, তবে বেশী নয়; কারণ, উহাতে পাকস্থলীর গোলমাল হইয়া বমন আরম্ভ হইতে পারে এবং পুনরায় রক্ত উঠার আশঙ্কা থাকে। অল্প পরিমাণ রক্ত উঠিলে বিশেষ কোন ঔষধ-পত্রের প্রয়োজন হয় না,—উপরোক্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন-কালীন আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। তবে রক্ত বেশী উঠিতে থাকিলে ও ডাক্তার আসিতে বিলম্ব ঘটিলে আধ ছটাক পরিমাণ আয়াপানের (বিশল্যকরণী) রস খাইতে দেওয়া যায়। জেলেটিন (geletine) জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, উহার একটু একটু খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। বুকের যে দিক্ হইতে রক্ত উঠে, সেই দিকের উপরে আইস্-ব্যাগে করিয়া বরফ দেওয়া যাইতে পারে। উহাতে বিশেষ উপকার হউক বা না হউক, রোগীর মনটা শান্ত হয় এবং রোগী মনে করে যে, একটা কিছু করা হইতেছে। অন্ততঃ বুকের ধড়-ফড়ানিটা নিবারিত হয়। অন্যান্য ঔষধাদি ডাক্তারের উপদেশ মত দেওয়া কর্ত্তব্য।

রক্ত উঠিবার অব্যবহিত পরেই পথ্য দেওয়া উচিত নহে। কয়েক দিন শক্ত জিনিস খাইতে দেওয়া উচিত নহে। তরল পথ্য ঠাণ্ডা করিয়া দিবে। ৩।৪ ঘণ্টা পর পর ২।৩ আউন্স করিয়া ঠাণ্ডা দুধ, দুধবার্লি বা দুধসাগু, এমন কি, অবস্থাবিশেষে হরলিকস্ মল্‌টেড্ ফুড্ (Horlick's Malted Food) দিবে। ফলাদির রসও ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ৩।৪ দিন একাদিক্রমে রক্ত উঠা বন্ধ থাকিলে, তবে পথ্যাদি সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই অল্প পথ্যের দরুন রক্ত চলাচলের জোর কম থাকে এবং রক্ত উঠার আশঙ্কাও কম হয়। এ সময় ব্র্যাণ্ডী বা কোন উত্তেজক ঔষধ দেওয়া উচিত নহে। কেবল ক্যালসিয়াম ল্যাক্‌টেট্ বা ক্লোরাইড ১০।১৫ গ্রেণ, জলের সহিত ২।১ মাত্রা দেওয়া চলে।

কোষ্ঠ যাহাতে বিশেষ পরিষ্কার থাকে, তাহা করা কর্ত্তব্য। কাশি হইতে থাকিলে রক্ত উঠার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং কাশি যাহাতে না হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। কাশি আসিলে অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া উহা কতকটা বন্ধ করা যায়। দরকার হইলে এ সম্বন্ধে ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে কাশির উত্তেজনা জন্মিতে পারে, সেরূপ কোন জিনিষ যাহাতে রোগীর নিকটে না থাকে, তাহা দেখিতে হইবে। তামাক ও সিগারেট অভ্যাস থাকিলে উহা এ সময় বন্ধ থাকিবে, ঘরে অপর কেহও ধূম পান করিতে পারিবে না। কোনরূপ ধোঁয়া বা উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট জিনিষ যাহাতে রোগীর নিকট পৌঁছিতে না পারে, তাহার

ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সব লোক রোগীর জন্য বৃথা ব্যস্ত হয় বা সামান্য ব্যাধিকে বৃহৎ করিয়া রোগীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে, সেরূপ আত্মীয় বা অপর কাহাকেও রোগীর নিকট যাইতে দেওয়া সমীচীন নহে।

এইরূপ সাবধানমত রাখিলে সত্বরেই রোগীর রক্ত উঠা বন্ধ হইবে। রক্ত উঠার শেষ দিন হইতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত রোগীকে বিশেষ সাবধানে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। তখন পথ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দুধসুজি বা দুধরুটী অথবা পাউরুটী, পরে আস্তে আস্তে দুধ ভাত আরম্ভ করা যাইতে পারে। আর মাংসটা কয়েক দিন না দেওয়াই ভাল।

সামান্য ছিটে ফোঁটা রক্ত উঠিলে পথ্যের এতটা কড়াকড়ির প্রয়োজন নাই। রক্ত উঠাটা যে সব সময়ই খারাপ, তাহা নহে। প্রথম অবস্থায় উহা হইতে অনেক সময়ে উপকার হইতেও দেখা যায়। এই রক্ত উঠার পর কখনও কখনও ফুসফুসের সমস্ত লক্ষণ লোপ পাইতে দেখা গিয়াছে ও রোগী ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। আবার ইহা হইতে খারাপও যে না হয়, তাহা নহে। অনেক সময় রক্ত-মোক্ষণের পর ব্যাধি নানাস্থানে নূতন করিয়া সঞ্চারিত হয় ও দ্রুত বাড়িয়া যায়। সুতরাং এই রক্ত-মোক্ষণের পর রোগীর অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। রক্ত-মোক্ষণে যদিও আশু ভয় নাই, তথাপি রক্তহানির দরুন শারীরিক দুর্ব্বলতা ঘটে। যাহাতে বিশেষ সাবধানে থাকিয়া শরীর সারিয়া উঠে, তৎপ্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

রোগী অনেক সময় রক্ত গিলিয়া ফেলে; উহা কদাচ উচিত নহে। উহাতে ক্ষয়-বীজ নানা স্থানে নীত হইয়া নানা স্থানের ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে।

হাসপাতালে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, একজনের রক্ত-মোক্ষণ হইলে সেই সময়ে অপর কতকগুলি রোগীরও রক্ত-মোক্ষণ হইতেছে। উহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ উহা কোনরূপ সংক্রামক উপায়ে ঘটিয়া থাকে। এই জন্য রক্ত উঠিলেই রোগীকে আলাহিদা স্থানে ভিন্নভাবে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। অবশ্য নিজ বাটিতে সেরূপ করার আবশ্যক হয় না।

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, এইরূপ এক সময়ে রক্ত-মোক্ষণের কারণ জল হাওয়ার অবস্থার দরুন ঘটে। যখন স্যাঁৎসেঁতে গরম হাওয়া দেয়, প্রায় সেইরূপ সময়েই ইহার আধিক্য দেখা যায়। শীতকালে ততটা বেশী রক্ত উঠিতে দেখা যায় না।

এখন এই বক্তব্য যে, রক্ত উঠিলেই একটা হৈ চৈ করিবে না। ভয় পাইলে আরও রক্ত উঠিতে থাকে মাত্র।

রোগীকে অভয় ও আশ্বাস দিবে। বাস্তবিক ভয়ের সেরূপ কোনও কারণই নাই। রোগী যদি সুস্থভাবে বিশ্রামে থাকে ও যে সব নিয়মের কথা বলা হইল, তাহা পালন করে, তাহা হইলে সহজেই রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

অনেকে রক্ত উঠাতে ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বায়ু পরিবর্ত্তনে

যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়; কিন্তু উহা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু দীর্ঘ পথ যাইতে হইলে অধিক নড়াচড়া হওয়ার সম্ভাবনা ও উহাতে পুনরায় রক্ত উঠার আশঙ্কা থাকে।

যাহাদের বারবার রক্ত উঠে, তাহাদের সম্বন্ধে আরও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। ডাক্তারের নিকট হইতে সবিশেষ উপদেশ লইয়া দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রক্ত উঠা সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলা হয় নাই। এই প্রথম ভাগে যে রক্ত উঠে, উহা সাধারণতঃ শিরা (vein) হইতে নির্গত হয় বলিয়া উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেখায়। ফুস্‌ফুসের শিরাসমূহে বিশুদ্ধ রক্ত (oxygenated) থাকে; কিন্তু ধমনীতে (artery) দূষিত রক্ত থাকে, সেই জন্য শেষ দিকে যে রক্ত উঠে, উহা উজ্জ্বল লালবর্ণের নহে, বরং একটু কালো রঙ্গের।

রক্ত উঠার সময় শরীরের তাপ যেমন স্বাভাবিকের নীচে যায়, পরে আবার একটু স্বাভাবিকের উপরে উঠে। কিন্তু ক্রমশঃই উহা স্বাভাবিক হইয়া আসে।

ব্যথা

যক্ষ্মা রোগে অধিকাংশ সময়েই বুকে, পিঠে, পাঁজরে ও নানা স্থানে ব্যথা হয়। উহা কোন সময়ে অল্প অল্প, কোন সময়ে বা অসহ্য হইয়া পড়ে। মনে হয়, কেহ যেন বুকের ভিতরে ছুরী বসাইয়া দিতেছে। এই সব ব্যথা প্রায়শঃই জোরে শ্বাস লইবার সময় বা বসিবার সময় বৃদ্ধি হয় ও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হইয়া

থাকে। ইহার উৎপত্তি অধিকাংশ সময়েই প্লুরিসি হইতে। ফুস্ফুসের আবরণের (Pleura) প্রদাহ হইয়া উহা শেষে নানা স্থানে আটকাইয়া যায় এবং শ্বাস লইবার সময় বা কাশিবার সময় যখন টান লাগে, তখনই বেদনায় প্রাণ অস্থির হয়। কাজেই চিকিৎসা করিতে হইলে যাহাতে উহার প্রদাহ নিবারণ হয় বা টান না পড়ে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হয়। একটু ইউকালিপ্টাস্ অয়েল (Eucalyptus oil) বা ভ্যাসোজেন আইওডিন (Vasogen Iodine) বা লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফার কম্পাউণ্ড, (Lin. Camph. Co.) অথবা লিনিমেণ্ট বেলেডোনা (Lin. Belladona) মালিস করিলে ব্যথা কমিয়া যাইতে পারে। বেদনার স্থানে টিংচার আইওডিনের (Tinct. Iodine) প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। সময় সময় বেলেডোনা প্লাস্টার (Belladona Plaster) বা কম্পাউণ্ড মেন্থল ও বেলেডোনা প্ল্যাষ্টার (Comp. Menthol & Bellad. Plaster) বেদনা স্থানে লাগাইয়া দিলে উপশম বোধ হয়। যদি উহাতেও উপশম বোধ না হয়, তবে ষ্টিকিং প্ল্যাষ্টার (Sticking Plaster) দ্বারা বুকের সামনের দিক্ থেকে পেছন দিকের শীলদাঁড়ার হাড় পর্য্যন্ত আট্কাইয়া দিতে হয়। ষ্টিকিং প্ল্যাস্টারগুলি সাধারণতঃ ১ ইঞ্চি হইতে ২।৩ ইঞ্চি চওড়া থাকে, তবে লম্বায় অনেকটা থাকে ও রিলে (Reel) করিয়া জড়ান থাকে। উহা আবশ্যকমত লম্বা অনুসারে কাটিয়া লইয়া রোগীকে জোরে শ্বাসত্যাগ করিতে বলিয়া উহার একপ্রান্ত বুকের সামনের দিকে

আটকাইবে ও অপর প্রান্ত বেশ টানের উপর রাখিয়া পাশ দিয়া লইয়া একেবারে পেছনে লাগাইয়া দিবে।

প্রথমে একটা লাগাইয়া উহার কতকটা অংশের উপর দিয়া অথবা নীচে আর একটা, এইরূপ উপরি-উপরি (overlapping) ভাবে পূর্ব্বের ন্যায় লাগাইবে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত সমস্ত পাশটা ঢাকা না পড়ে—ক্রমে আটকাইয়া যাইবে। উহা লাগাইবার পূর্ব্বে স্থানটী লোমশূন্য করিয়া লইলে ভাল হয়, নতুবা উঠাইবার সময় লে মে বড় টান লাগে। এ সব ডাক্তারদের দ্বারা করানই ভাল। পরে উহার উপরে একটা ব্যাণ্ডেজ (Bandage) বাঁধিয়া দিবে, তাহা হইলে কাশিবার সময় বুকটায় আর নাড়াচাড়া পড়িবে না ও বেদনার লাঘব হইবে। যে সব স্থানে ষ্টিকিং-প্ল্যাষ্টার পাওয়া যায় না, সে সব স্থানে শুধু ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেও অনেকটা উপশম হইবে।

খাওয়ার ঔষধের মধ্যে অ্যাস্পিরিণ ট্যাব্‌লেট (Aspirin Tablet) ৩ হইতে ৫ গ্রেণ করিয়া দিলে, একবার কি দুইবার খাওয়ান যাইতে পারে। অথবা ফেনাল্‌জিন্ ট্যাব্‌লেট (Phenalgin Tablet) ২৷৹ গ্রেণ করিয়া দিলে একবার কিংবা দুইবার খাওয়ান যায়।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণেও বেদনা হইতে পারে। অত্যন্ত কাশি হইলে, কাশিতে কাশিতে পাঁজরার হাড় প্রভৃতিতে বেদনা হইয়া যায়। এ সব সময়ে কাশি নিবারণের ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। কখন কখনও দুর্ব্বলতার দরুন বা শরীর রোগা হওয়ার

কারণ দেহে মাংস না থাকায়, শক্ত বিছানায় শুইলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়। তাহা হইলে বিছানা নরম করিয়া দিয়া একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিলেই ঐ বেদনা নিবারণ হইবে।

অনেক সময় নিউরেলজিক্ (Neuralgic) বেদনাও হইয়া থাকে, তখন উহার উপযুক্ত ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। কখন কখনও বেদনা এমন অসহ্য হয় যে, কিছুতেই আর স্বস্তি বোধ হয় না। তখন ডাক্তার আনাইয়া মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন (Morphine-Injection) না করিলে উহা কিছুতেই নিবারণ হয় না।

সর্দ্দী

সুস্থ শরীরে সর্দ্দী লাগিলে আমরা উহাকে আমলেই আনি না। ক্ষয়রোগীর সর্দ্দী হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। কারণ, তখন শরীর একান্ত দুর্ব্বল থাকে এবং অল্পতেই অধিক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এই সর্দ্দীই অবশেষে শ্বাসপথে ক্রমে নীচে নামিয়া ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ঘটাইয়া ফুস্‌ফুসের অনিষ্ট সাধন করে। কখনও দেখা যায়, রোগী অনেকটা ভাল হইয়াছে, একটু খাইতে পারিতেছে ও দু'পা চলিয়া বেড়াইতে পারিতেছে; হঠাৎ একদিন সর্দ্দী লাগিল। সামান্য জ্ঞানে উহার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হইল না বা উহার কোন প্রতিকারও করা হইল না। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিল এবং রোগ বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। অনেক সময়েই এইরূপ সর্দ্দী লাগিয়া ব্যাধির পুনরা-

ক্রমণ হয়। সুতরাং অতি তুচ্ছ বিষয় হইলেও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার আক্রমণ প্রায়শঃই ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ঐ সময়ে যাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে, সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন, গায়ে সর্ব্বদা উপযুক্ত কাপড় থাকা উচিত। যাহারা সর্দ্দীতে ভুগিতেছে, তাহাদের নিকট যাওয়া উচিত নহে, কারণ, সর্দ্দী ব্যারামটা অধিকাংশ সময়েই সংক্রামক।

সর্দ্দী হইয়া পড়িলে যাহাতে উহা সত্বরে সারিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। অনেক সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া গেলে উহা কমিয়া যায়। সুতরাং একটু ক্যাষ্টর অয়েল (Castor oil) বা এক চামচ এনোস্ ফ্রুট সল্ট (Eno's Fruit Salt) বা ঐরূপ অপর কোন দাস্তের ঔষধ খাওয়া মন্দ নহে। সময় সময় ফুট-বাথ্ (Foot bath) লইলে উপকার হয়। গরম জল খাওয়া, গরম জলের ভাপ লওয়া—উহাতে একটু ইউকালিপ্টাস্ অয়েল বা টিংচার বেন্‌জোইন্ কম্পাউণ্ড (Tinct. Benzoin Co.) দিলে আরও ভাল হয়। ইউকালিপ্টাস্ অয়েল বা মেন্থল (Menthol) শোঁকা যাইতে পারে। সময় সময় গরম চায়ের ভিতর আদার কুচি বা রস দিয়া খাইলেও উপকার হয়। যেমন করিয়াই হউক, সর্দ্দী নিবারণ করা একান্ত আবশ্যক। প্রয়োজন বোধ করিলে ডাক্তারের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া খাইবে। এ সময়ে বিশ্রামে থাকা খুব উপকারী। বিছানায় একদিন শুইয়া থাকিলেই হয়ত সর্দ্দী কমিয়া যাইবে। গায়ে জামা দিয়া ঘরের দরজা জানালা

বেশ করিয়া খুলিয়া দিবে, যেন ঘরে নির্ম্মল বায়ু চলাচল করিতে পারে। সর্দ্দী হইলেই ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করা উচিত নহে। তবে ঘরে ধূলি, বালু বা ধোঁয়া না যায়, তাহা দেখিতে হইবে। ইহাকে সামান্য বলিয়া কখনই উপেক্ষা করিবে না।

কাশি

যক্ষ্মা রোগে প্রায় প্রথম হইতেই কাশির উপদ্রব হয় এবং এ রোগ যত দিন থাকে, ততদিন উহা কোন সময়ে বেশী, কোন সময়ে বা কম হয়। যখন এ ব্যাধিতে প্রায়শঃই আনুষঙ্গিক কাশি থাকে, তখন উহার বিশেষ একটা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। কাশি হইলেই যে একটা কিছু খারাপ হয়, তাহা নহে, যেহেতু এই কাশির সহিত শ্লেষ্মা এবং তৎসঙ্গে অপরাপর অনেক দূষিত পদার্থ উঠিয়া বাহির হইয়া যায় এবং তজ্জন্য শরীরের উপকারই হয়। কাশি নানা কারণে হইতে পারে; এই সব কারণ নির্দ্দেশ করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে মনোযোগী হইতে হয়। শ্বাস-নালীগুলির ভিতর ক্রমে শ্লেষ্মা জমিতে থাকে এবং উহা বাহির করিয়া দিবার চেষ্টার সময় কাশি হয়। শ্বাস-নালীতে নানারূপ সুড়সুড়ি (irritation) বা প্রদাহের দরুন কাশি হইতে পারে। সময় সময় উভয় কারণ একযোগে কার্য্য করে। সাধারণতঃ ভোরের দিকে কাশি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ রাত্রে শ্বাস-নালীসমূহ হইতে যে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, উহা উঠিয়া

বাহিরে না আসিতে পারায়, উহার ভিতরে জমিয়া থাকে এবং ঘুম ভাঙ্গিলেই উহা শ্বাসনালীর সুড়সুড়ি উৎপাদন করে ; এবং ঐ কারণে, যে পর্য্যন্ত শ্লেষ্মা বাহির না হইয়া আসে, সে পর্য্যন্ত কাশি বন্ধ হয় না। গরম জল ও গুঁড়া সোডা (Soda Bicarb) একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইলে ইহার উপশম ঘটিতে পারে। গরম দুধেও অনেক উপকার করে। গলার ভিতরে প্রদাহ বা কোনরূপ উত্তেজনা (irritation) হইয়া কাশি হইলে কোন উত্তেজনানিবারক (Sedative) ঔষধের প্রলেপ দিলে উপশম হয়। কষ্টিক লোশন্, (Caustic Lotion 10 to 20 grs. to ozi), গ্লিসিরিন এসিড ট্যানিক্ (Glycerini acidi Tannici), টিংচার ষ্টীল (Tinct. Steel ozi) প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। তবে চিকিৎসকের উপদেশমত ঔষধ ব্যবহার করাই সঙ্গত। কাহারও বরফজল খাইলে গলার সুড়সুড়ি বারণ হয় ; কাহারও আবার গরম জলের দরকার। ক্ষয়-রোগীদের জন্য শ্বাসের সহিত টানিয়া লইবার নানাবিধ ঔষধ (Drugs for inhalation) প্রায়শঃই দেওয়া হয়। সময় সময় ইহারাই গলায় সুড়সুড়ি সৃষ্টি করে। সুতরাং এ বিষয়েও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ঐ ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলে কাশি নিবারিত হয় কি না, তাহাও দেখা উচিত।

অনেক রোগীর স্বভাব স্বতঃই খিট্‌খিটে। উহারা অতি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে। উহাদের সহিত অতি ধীরভাবে ও বিবেচনার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহারা

যে কাশে, তাহা অধিকাংশ সময়েই অভ্যাস-দোষ মাত্র। সুতরাং উহারা চেষ্টা করিলে এই কাশি ইচ্ছামত দমন করিতে পারে। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন একটা আমোদজনক বিষয়ে ইহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে কাশি আপনা হইতেই বন্ধ হয়। অনেক সময় কাশি যে ইচ্ছা করিয়া বন্ধ করা যায়, তাহা উহারা যখন অন্য দশ জনের মধ্যে থাকে, তখন দেখা যায়। কারণ, তখন উহাদিগকে একবারও কাশিতে দেখা যায় না। অথচ যখন নিজের ঘরে থাকে, তখন অনবরত কাশিতে থাকে।

কাশি আসিবার কালে যদি আস্তে আস্তে শ্বাস টানিয়া লওয়া যায় ও ৫।১০ সেকেণ্ড শ্বাসরোধ করিয়া রাখা যায়, তবে উহা প্রায়শঃই বন্ধ হয়। অথবা শ্বাস লইয়া আস্তে আস্তে ত্যাগ করিতে থাকিলে বা সময় সময় শুধু গভীর শ্বাস লইয়া বা ত্যাগ করিয়াও উহা দমন করা যাইতে পারে।

যাহাতে কাশি বন্ধ হয় তাহা করিতেই হইবে। যেহেতু প্রতিবার কাশিবার সময়েই ফুস্‌ফুসের উপর জোর পড়ে এবং উহাতে ফুস্‌ফুসের ব্যাধি বাড়িবার ও নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয়।

কোন কোন রোগী উঠিয়া বসিলেই কাশি আরম্ভ হয়; আবার কাহারও শুইলেই উহা শুরু হয়। সুতরাং যাহার যেরূপ-ভাবে সুবিধা হয়, সেইরূপে থাকাই কর্ত্তব্য। শুইতে না পারিলে পেছনে বালিস প্রভৃতি দ্বারা ঠেস্ দিয়া কিছু আরামের বন্দোবস্ত

করা উচিত এবং ঐ ভাবে যাহাতে রোগী ঘুমাইতেও পারে, তাহাও করা উচিত। যদি উঠিলেই কাশি বৃদ্ধি পায়, তবে কয়েক দিন বিশ্রামে শুইয়া থাকাই ভাল।

কাশির অবস্থায় কোনরূপে জোরে কথা বলা বা বেশী কথা বলা বা জোরে হাসিতামাসা করা উচিত নয়।

পেটের গোলযোগ থাকিলে উহা বন্ধ করা দরকার। নির্ম্মল বায়ুতে কাশির বেশ উপকার করে। সুতরাং রোগী যাহাতে নির্ম্মল বায়ু প্রচুররূপে পাইতে পারে ও একান্ত বিশ্রামে থাকিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

অনেক সময় হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটীস্ বা অন্য নানাবিধ কারণে কাশি দেখা দেয়, তখন উহা নিবারণের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া ঔষধ সেবন করা আবশ্যক।

গলার সুড়সুড়ি নিবারণের জন্য ফর্মামিণ্ট ট্যাব্‌লেট (Formamint Tablet), ভয়েস ট্যাব্‌লেট (VoiceTablet),ট্যাবলয়েড বেঞ্জোয়িক্ এসিড কম্পাউণ্ড(Tabloid Acidi Benzoici Co.) পেপ্‌স (Peps), মেন্থল ও ইউকালিপ্টাস্ প্যাস্‌টাইল (Menthol and Eucalyptus Pastille) প্রভৃতি নানাবিধ চাকতি-সকল ব্যবহৃত হয়। উহার একটা মুখে রাখিয়া চুষিয়া খাইতে হয়। দরকার হইলে দিনে ৪।৫টা খাওয়া যায়। কাশির চিকিৎসা করা একান্তই আবশ্যক। কাশিতে রোগীকে যে কেবল দুর্ব্বল করে, তাহা নহে, ইহা ব্যাধি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

শ্বাসকষ্ট

এই রোগের প্রথম অবস্থায় শ্বাসকষ্ট হইতে প্রায়শঃই দেখা যায় না। শেষ অবস্থায় সময় সময় শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। প্রায়ই কোনরূপ পরিশ্রমের পর ইহা দেখা দেয়। সুতরাং রোগী যাহাতে একান্ত বিশ্রামে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর নির্ম্মল বায়ুর ব্যবস্থা করাও দরকার। কখন কখন, যখন শেষ অবস্থায় রোগীর ফুস্‌ফুসের অধিকাংশ ক্ষয় হইয়া যায়, তখন অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ঘটিতে পারে। তখন কখনও বা শ্বাসের সহিত অক্সিজেন গ্যাস্ (Oxygen), কখনও বা মরফিন্ ইন্‌জেক্‌শন (Morphine Injection) দিলে রোগীর কষ্টের লাঘব হয়। যদি হাঁপানীর জন্য শ্বাসকষ্ট হয়, তবে উহার চিকিৎসা প্রয়োজন। এই শ্বাসকষ্ট হার্টের (Heart) দুর্ব্বলতায় ও অন্যান্য অনেক কারণে হইতে পারে। তখন উহাদের পৃথক্ চিকিৎসা আবশ্যক। সকল অবস্থায়ই বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজনীয়।

অনিদ্রা

অনেক সময় রোগীর রাত্রে সুনিদ্রা হয় না। নিদ্রা দেহরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। রাত্রে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকাতে রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে। রাত্রিতে সব দরজা জানালা খুলিয়া রাখিবে ও যাহাতে ঘরে প্রচুর হাওয়া

যাতায়াত করিতে পারে, তাহা করিবে। নির্ম্মল বায়ু নিদ্রার সহায়ক। শয়নকালে এক পেয়ালা গরম দুধ বা উহাতে একটু ব্রাণ্ডী (Brandy) মিশাইয়া খাইলে সুনিদ্রা হয়। সময় সময় কাশির উৎপাতের দরুন ঘুম হয় না, তখন কাশি নিবারণ দরকার। অনেক সময় গুরু ভোজনের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। ছারপোকা মশা ত আছেই। গৃহে সুগৃহিণী থাকিলে এ বিষয়ে অবশ্যই সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে। সময় সময় ইহা ভিন্ন অন্যবিধ নানা কারণেও নিদ্রা হয় না। তখন ঔষধাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভেরোনাল (Veronal), ক্লোরেটোন (Chloretone), ব্রোমাইড (Bromide) বা ঐ জাতীয় ঔষধাদি দেওয়া চলে। শুইবার সময় গরম জল দ্বারা স্নান করাইয়া দিলে সুনিদ্রা হওয়ার সম্ভাবনা।

রাত্রে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম (Night Sweats)

যক্ষ্মা রোগীর অধিকাংশেরই রাত্রে বিশেষতঃ ভোরের দিকে ঘাম হইয়া থকে। উহাতে জামা কাপড় বিছানার চাদরাদি প্রায়শঃই ভিজিয়া যায় এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হয়। ইহা যক্ষ্মা রোগের যে-কোন সময়েই দেখা দিতে পারে। তবে প্রথম অবস্থায় বা ব্যাধি আরোগ্য হইবার মুখে তত বেশী হয় না। রোগ যখন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই ইহার প্রাবল্য হয়। অথবা এই রোগের উপরে যখন অন্যবিধ বিষের (Secondary Infec-

tions) সংক্রমণ হয় এবং শরীরকে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিয়া দেয়, তখনও খুব ঘাম হয়। অনেক সময় নিদ্রার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখা যায়। এই ঘাম যে কি কারণে হয়, তাহা সব সময়ে ধরা সহজ নহে। প্রধানতঃ ক্ষয়-জীবাণু ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য জীবাণুনিঃসৃত বিষ (Toxin) যখন স্বেদগ্রন্থিসমূহ (Sweat Glands) ও তাপ-উৎপাদক কেন্দ্রের উপর কার্য্য করে, তখন এই ঘর্ম্ম উৎপাদিত হয়। সময় সময় অন্যান্য কারণেও এই অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। যদি রাত্রে একই সময়ে রোজ ঘাম হয়, তবে সম্ভবতঃ উহা জ্বর ত্যাগের সময় হইয়া থাকে; অনেক সময় দুর্ব্বলতার দরুন ঘাম হইয়া থাকে। সময় সময় চক্ষের কোন বিশেষ অবস্থায়ও ঘাম হয়। কখনও বা খুব কাশিতে থাকিলে, উহার পরে দুর্ব্বলতার দরুন অতিশয় ঘাম হয়। কখনও রাত্রিবাসের বস্ত্রাদি যদি গরম বা ভারি হয়, অথবা বিছানার চাদর মসৃণ ও কোমল না হয়, তাহা হইলেও ঘাম হইতে পারে।

ঘাম বন্ধ করিতে হইলে এই সকল কথা মনে রাখিতে হইবে। যেহেতু কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া ব্যবস্থা করিলে ফল ত হইবেই না, অধিকন্তু রোগীকে অনর্থক বিরক্ত করা হইবে। মূল ব্যাধির চিকিৎসা ও শরীরে বলাধান করাই এই ঘাম নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়; সুতরাং ডাক্তারের উপদেশ মত চলিতে হইবে। তবে যদি দেখা যায়, গায়ের কাপড় চোপড় বা বিছানার চাদরাদি ভারি এবং গরম হওয়ার দরুন শরীরকে উত্তেজিত করিতেছে, তবে উহা বদলাইয়া হাল্কা মসৃণ কাপড়াদি

দিবে। শরীরে অনেকগুলি জামা কাপড় দেওয়া কখনই সঙ্গত নহে। যদি মনে হয়, কাশির দরুন দুর্ব্বলতা আসিতেছে, তবে কাশি নিবারণের উপায় করিবে। কাপড় চোপড় যখনই ঘামে ভিজিয়া যাইবে, তখনই উহা বদলাইয়া দিবে। শরীরটা মুছাইয়া দিবে এবং বেশ করিয়া সাবধানে রগড়াইয়া দিবে। দরকার হইলে বোরেটেড্ ট্যাল্ক পাউডার (Borated Talc Powder) বা অপর কোন ভাল পাউডার, কিংবা ডাক্তার যদি কোন পাউডার দেন, উহা শরীরে মাখাইয়া দিবে। ঘরে যাহাতে বেশ হাওয়া খেলে, রোগীর খাওয়া দাওয়া নিয়মিত ও পরিমিতরূপে হয়, কোষ্ঠ বেশ খোলসা থাকে ও পেটের গোলযোগ না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। কখনও বা শুইবার সময় শরীরটা ঠাণ্ডা জলে মুছাইয়া দিলে ঘাম নিবারিত হয়। উহা সত্ত্বেও যদি ঘাম হইতে থাকে, তবে ডাক্তারের উপদেশমত চলিবে। হয় ত ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হইবে। যদি জ্বরের দরুন ঘাম হয়, তবে জ্বর বন্ধ করিবার ঔষধ খাওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় রাত্রে একটু খাইতে পাইলে শরীর সবল থাকে ও ঘামটা বারণ হয়। কখন কখনও ইন্‌জেক্‌শন্ দ্বারা ঔষধ প্রয়োগে ঘর্ম্ম বন্ধ হইতে পারে। ইন্‌জেক্‌শনে সাধারণতঃ এট্রপিন (Atropine) ব্যবহৃত হয়।

অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা প্রভৃতি

(Disorders of Digestion)

কোন কোন যক্ষ্মা-রোগীর প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অবধিই অরুচি, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি থাকে। ক্ষয়-রোগীর পক্ষে এই হজম-শক্তির অভাব বড়ই গুরুতর। যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসার সময় আমাদের একটা কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, ডাক্তারগণ মূল ব্যাধিকে দূরীভূত করিবার চেষ্টায়, ফুস্‌ফুসের উপর যেখানে ব্যাধির প্রধান প্রকোপ, সেখানে প্রত্যক্ষভাবে বড় একটা কিছু করিবার সুবিধা পান না। তাই ব্যাধিকে নানা দিক্ দিয়া নানা উপায়ে আক্রমণ করিয়া, উহাকে কাবু করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

প্রকৃতির সাহায্যে, অর্থাৎ পরিষ্কার বাতাস, ভাল খাদ্য ও বিশ্রামে রাখিয়া রোগীকে ভাল করিতে চেষ্টা করিবে। রোগীকে যদি বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া যায় এবং উহা যদি উত্তমরূপে পরিপাক হয়, তবে তদ্দারা দেহের বল বৃদ্ধি হইয়া রোগকে দূরীভূত করিতে বিলম্ব লাগে না। সুতরাং যাহাতে হজমের গোলযোগ না ঘটে বা ঘটিলে উহা সত্বরে নিরাকৃত হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অধিকাংশ সময়েই অক্ষুধা হয়, মুখে কিছুই ভাল লাগে না বা কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে না; সময় সময় এতদূরও গড়ায় যে, আহার্য্য জিনিস দেখিবামাত্রই ঘৃণা হয় বা বমি আইসে। সামান্য অক্ষুধা হইলে, অনেক

দিবে। শরীরে অনেকগুলি জামা কাপড় দেওয়া কখনই সঙ্গত নহে। যদি মনে হয়, কাশির দরুন দুর্ব্বলতা আসিতেছে, তবে কাশি নিবারণের উপায় করিবে। কাপড় চোপড় যখনই ঘামে ভিজিয়া যাইবে, তখনই উহা বদলাইয়া দিবে। শরীরটা মুছাইয়া দিবে এবং বেশ করিয়া সাবধানে রগড়াইয়া দিবে। দরকার হইলে বোরেটেড্ ট্যাল্‌ক পাউডার (Borated Talc Powder) বা অপর কোন ভাল পাউডার, কিংবা ডাক্তার যদি কোন পাউডার দেন, উহা শরীরে মাখাইয়া দিবে। ঘরে যাহাতে বেশ হাওয়া খেলে, রোগীর খাওয়া দাওয়া নিয়মিত ও পরিমিতরূপে হয়, কোষ্ঠ বেশ খোলসা থাকে ও পেটের গোলযোগ না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। কখনও বা শুইবার সময় শরীরটা ঠাণ্ডা জলে মুছাইয়া দিলে ঘাম নিবারিত হয়। উহা সত্ত্বেও যদি ঘাম হইতে থাকে, তবে ডাক্তারের উপদেশমত চলিবে। হয় ত ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হইবে। যদি জ্বরের দরুন ঘাম হয়, তবে জ্বর বন্ধ করিবার ঔষধ খাওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় রাত্রে একটু খাইতে পাইলে শরীর সবল থাকে ও ঘামটা বারণ হয়। কখন কখনও ইন্‌জেক্‌শন্ দ্বারা ঔষধ প্রয়োগে ঘর্ম্ম বন্ধ হইতে পারে। ইন্‌জেক্‌শনে সাধারণতঃ এট্রপিন (Atropine) ব্যবহৃত হয়।

অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা প্রভৃতি

(Disorders of Digestion)

কোন কোন যক্ষ্মা-রোগীর প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অবধিই অরুচি, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি থাকে। ক্ষয়-রোগীর পক্ষে এই হজম-শক্তির অভাব বড়ই গুরুতর। যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসার সময় আমাদের একটা কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, ডাক্তারগণ মূল ব্যাধিকে দূরীভূত করিবার চেষ্টায়, ফুস্‌ফুসের উপর যেখানে ব্যাধির প্রধান প্রকোপ, সেখানে প্রত্যক্ষভাবে বড় একটা কিছু করিবার সুবিধা পান না। তাই ব্যাধিকে নানা দিক্ দিয়া নানা উপায়ে আক্রমণ করিয়া, উহাকে কাবু করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

প্রকৃতির সাহায্যে, অর্থাৎ পরিষ্কার বাতাস, ভাল খাদ্য ও বিশ্রামে রাখিয়া রোগীকে ভাল করিতে চেষ্টা করিবে। রোগীকে যদি বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া যায় এবং উহা যদি উত্তমরূপে পরিপাক হয়, তবে তদ্দ্বারা দেহের বল বৃদ্ধি হইয়া রোগকে দূরীভূত করিতে বিলম্ব লাগে না। সুতরাং যাহাতে হজমের গোলযোগ না ঘটে বা ঘটিলে উহা সত্বরে নিরাকৃত হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অধিকাংশ সময়েই অক্ষুধা হয়, মুখে কিছুই ভাল লাগে না বা কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে না; সময় সময় এতদূরও গড়ায় যে, আহার্য্য জিনিস দেখিবামাত্রই ঘৃণা হয় বা বমি আইসে। সামান্য অক্ষুধা হইলে, অনেক

সময়েই একটু বিশ্রামে রাখিলে বা যে সব স্থানে সর্ব্বদা বায়ু চলাচল করে, তথায় রাখিলে এবং খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে যদি একটা ভাল না লাগিল, তবে অন্যটা দেওয়া গেল,—এইরূপ করিলে প্রায়শঃই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, অধিক দিন বিশ্রামে থাকার দরুনই রোগীর অক্ষুধা হইয়াছে; সে ক্ষেত্রে রোগীকে একটু হাঁটিবার বা অপর কোন লঘু শ্রমের কাজ করিতে দেওয়া দরকার। উহাতেই ক্ষুধা বোধ হইবে।

অনেক সময় খাওয়ার দোষে খাদ্য দ্রব্যের উপর অরুচি জন্মিয়া যায় বা হজমের দোষ ঘটে। হয় ত একটা জিনিস এত বেশী খাইতে দেওয়া হইয়াছে যে, উহা আর পরিপাকের শক্তি নাই। খাওয়াটা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কার কতটা লাগিবে, কে কোন জিনিস কতটা হজম করিতে পারে, এ বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া দেখিলে কিছুই বুঝা যায় না। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই সব বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা একদিক্ হইতে কেবল ঠাসিয়া দিলে কখনও হজম হইবে না। কতকগুলি লোক আছে, যাহাদের কতকগুলি জিনিস সহ্য হয় না। একজনের হয় ত ডিম খাইলে বমি হয়, আর একজনের মাংসের জুস্ মোটেই সহ্য হয় না। কাহারও তরকারীতে এক টুকরা কুমড়া পড়িলেই বদ্ হজম হয়, কাহারও বা পেটে দুধ গেলেই অম্বল হয়। এই সব ব্যক্তিগত রুচির বৈষম্য লক্ষ্য করিতে হইবে। একজনের যাহা সহ্য হয়, অপরের তাহা হয় না, সুতরাং পেটের কোনরূপ গোলমাল হইলেই

প্রথমে আহার্য্য বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হইবে। অনেক সময় ঔষধাদির জন্যও পেটের গোলমাল ঘটিয়া থাকে, সেরূপ অবস্থায় ঔষধ বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিতে হইবে।

সময় সময় দাঁতের অবস্থা ভাল না থাকাতে খাদ্য দ্রব্য ভাল করিয়া চিবাইতে না পারায় হজমের অন্তরায় ঘটে, তখন দাঁতের চিকিৎসা প্রয়োজন। যদি দাঁত চর্ব্বণের অনুপযুক্ত হয়, তবে কৃত্রিম দাঁত বাঁধাইয়া লওয়া দরকার। সময় সময় দাঁতের গোড়ায় পূঁয হয় (Pyorrhea) এবং উহা খাদ্যের সহিত পাকস্থলীতে যাইয়া অজীর্ণ উৎপাদন করে। এ সব অবস্থায় দাঁতের গোড়ার রীতিমত চিকিৎসা দরকার।

যখন কোন উপায়েই ক্ষুধার উদ্রেক করা যায় না, তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া কোন নূতন স্থানে যাওয়া উচিত। সেখানকার নূতন দৃশ্য দেখিয়া মন প্রফুল্ল হইলে এবং খাদ্য দ্রব্যের যদি একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তবে সম্ভবতঃ ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা।

সময় সময় কড়ার নীচে পেটে বেদনা হয় বা অন্যান্য নানা উপসর্গ হয়। তখন ডাক্তারের পরামর্শমত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মা-রোগের প্রথম অবস্থায় পাকস্থলীর যতটা গোলমাল না দেখা যাউক, শেষ অবস্থায় প্রায়শঃই দেখা যায়। অনেক সময়ে রোগীকে মোটা করিবার জন্য তৈলাক্ত (Fatty) জিনিস খাইতে দেওয়া হয়। যথা, মাখন, কড্‌লিভার অয়েল (Cod-liver oil), পেট্রোলিয়াম ইমালশন্ (Petroleum

Emulsion) প্রভৃতি। কিন্তু উহা গুরুপাক বিধায় প্রায়শঃই হজম হয় না। সুতরাং উহা যদি সহ্য না হয়, তবে অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

কেহ কেহ এত পান বা গুপারি খায় যে, উহাতেও পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটায়। সুতরাং উহা বন্ধ করা দরকার বা ২।১ টায় সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।

অনেক সময় কোষ্ঠ খোলসা হইলে পেটের গোলমালগুলি কমিয়া যায়। কিন্তু রোগের এ অবস্থায় বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক বিরেচক ব্যবহার সঙ্গত। পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে গ্লীসীরিণ (Glycerine) প্রবেশ করাইয়া বাহ্য করাইলে বা ডুশ্ (Douche) দিলে কোন ভয়ের বা ক্ষতির কারণ নাই, বরং পেটটা পরিষ্কার করিয়া উপকার দর্শিবে।

পেটে যদি খুব বেদনা হয়, তবে রবারের ব্যাগে গরম জল ভরিয়া পেটের উপর সেক দিবে। টার্পেণ্টাইন্ ষ্টুপ্ (Terpentine Stupe) দেওয়া যাইতে পারে। মেন্থল ও বেলাডোনা প্ল্যাষ্টার (Menthol and Belladona Plaster) বা দরকার হইলে মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টারও (Mustard Plaster) দেওয়া যাইতে পারে।

যদি পেট ফাঁপে বা পেট ঘুট্ ঘুট্ করে, তবে টাইকো-সোডা ট্যাবলেট্ (Ptycho-soda Tablet) বা যোয়াইন জল (Aqua Ptychotis) বা ঐ জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বমন

যক্ষ্মা-রোগের যে-কোন সময়েই বমন আরম্ভ হইতে পারে। বমনের কোন স্থানীয় কারণ না দেখা গেলে, বুকটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা দরকার। যেহেতু ক্ষয়ের সূত্রপাতের সময় কখনও কখনও অগ্নিমান্দ্য ও বমনের ভাব লক্ষিত হয়। বমন সময় সময় এত কষ্টের কারণ হয় যে, উহার জন্য পথ্যাদি একেবারেই পেটে থাকে না; খাওয়া মাত্রই বমি হইয়া যায়। উহাতে শরীর ক্রমশঃই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং জীবনের সমূহ আশঙ্কা হয়। তখন সর্ব্বাগ্রে এই বমি নিবারণের উপায় খুঁজিতে হয়। এই বমি যে কি কারণে হয়, সকল সময়ে তাহা ধরা কঠিন। ঔষধ, পথ্য, জল, যাহা কিছু খাওয়া যায়, তাহাই বমি হইয়া যায়। খাওয়ার অব্যবহিত পরেই যদি বমি হয়, তবে পথ্যাদি সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। যে পথ্য চলিতেছে, তাহা বন্ধ রাখিয়া অন্য পথ্য খাইতে দেওয়া উচিত এবং উহা কিরূপ সহ্য হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা সঙ্গত। হয় ত দুধ সহ্য হইতেছে না, তখন উহাতে একটু সোডা ওয়াটার (Soda water) বা গুঁড়া সোডা দিয়া দেখা যাইতে পারে। উহাও যদি সহ্য না হয়, তবে দুধকে বরফদ্বারা ঠাণ্ডা করিয়া দেখা যাইতে পারে। দুধ যদি পেটে একেবারেই না থাকে, তবে বার্লি প্রভৃতি নেবুর রসের সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে। যদি উহাও পেটে না থাকে, তবে হর্‌লিক্‌স মলটেড্ ফুড

(Horlick's Malted food), মেলিনস্ ফুড্ (Mellin's food), স্যানাটোজেন (Sanatogen), গ্ল্যাক্সো (Glaxo) প্রভৃতি পথ্য চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে। হয় ত ছানার জল বা ঘোল সহ্য হইবে। নতুবা বেদানার রস, আঙ্গুর, কমলা লেবু, আনারস, পেঁপে, আম প্রভৃতি চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে। সময় সময় কাঁচা মাংসের রস (Raw meat juice), দিয়া দেখা যাইতে পারে। প্যানোপেপ্টন (Panopeptone), প্যালাটেবল পেপ্টন Palatabie (Peptone), ব্র্যাণ্ডস্ এসেন্স অব্ চিকেন (Brands Essence of chicken), প্রভৃতি রক্ষিত মাংসের জুস্ও (Preserved meat juice) দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে পথ্য দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। হয় ত খাওয়ার ½ ঘণ্টা পূর্ব্বে গরম জল একটু একটু করিয়া অল্প পরিমাণ খাইলে আহারের কালে বমি না-ও হইতে পারে। ঐরূপ খাওয়ার ২।৩ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার গরম জল খাইলে আহার্য্য উঠিয়া না যাইবারই সম্ভাবনা। কাহারও কাহারও বরফের টুকরা খাইলে বমি বন্ধ হয়। কখনও কখনও অর্দ্ধশায়িতভাবে আহার করিলে বমি হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়। সময় সময় পাকস্থলীর উপর ফোস্কা (Blister) ফেলাইলে বা প্রদাহজনক ঔষধাদি (Counter irritants) দিলে বমন বারণ হয়।

যদি ঔষধ খাওয়ার জন্য বমি হইতেছে মনে হয়, তবে ঔষধ সাময়িক বন্ধ করিয়া দিবে।

সময় সময় কাশি অত্যন্ত বাড়িবার জন্য বমি হয়। শ্বাস-

নালীগুলি প্রায়ই শ্লেষ্মায় ভরপূর থাকে। আহারের সময় শরীরের এই অংশে রক্তাধিক্যের দরুন আরও শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং এই শ্লেষ্মা বাহির করিবার জন্য অধিক কাশি হইতে থাকে এবং এই শ্লেষ্মা ও খাদ্য উভয়ই বমনের চেষ্টায় উদ্গত হয়। যদি এই কারণে বমি হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তবে খাওয়ার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে খানিকটা গরম জল খাইলে শ্লেষ্মা ও জল উভয়ই বমি হইয়া যাইবে। গরম জলে শ্লেষ্মা উঠাইতে সহায়তা করিবে এবং তৎপরে আহার করিলে সম্ভবতঃ বমিও হইবে না। এই বমির অবস্থায় রোগীর বিশ্রাম দরকার ও বেশ খোলা স্থানে প্রচুর হাওয়ায় রাখা আবশ্যক। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে, যাহাতে উহা পরিষ্কার হয়, তাহা করিবে। সময় সময় স্ত্রীলোকের এই ক্ষয়ের অবস্থায়ও গর্ভাধান ঘটে। গর্ভের অতি প্রথম অবস্থায় অনেকের অত্যন্ত বমি হয়— শেষের দিকেও হইয়া থাকে। এ বিষয়টি মনে রাখা একান্ত দরকার। যদি কোন উপায়েই এই বমন বারণ না করা যায়, তবে মাতার জীবন রক্ষার্থে এই গর্ভ নষ্ট করার প্রয়োজন হইতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে ডক্তারেরা পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয়, সেই যুক্তি দিবেন। কেবল মাতার জীবন রক্ষার্থেই এরূপ করা যাইতে পারে, অন্যথা নহে।

উদরাময়

যক্ষ্মা-রোগীর পেটের অসুখ হইলেই উহা ক্ষয়জনিত বলিয়া সন্দেহ হয়, কিন্তু উহা ভিন্নও অন্যান্য নানা কারণে উদরাময় হইতে পারে। প্রায়শঃই আহার্য্যের গোলযোগ হইতে এ সব ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আহারাদির বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার। প্রথম অবস্থায় মৃদু বিরেচক ব্যবহারে পেট পরিষ্কার করা ভাল। যে পর্য্যন্ত কোষ্ঠ খোলসা না হয়, সে পর্য্যন্ত ২।৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর এক চামচ করিয়া ক্যাষ্টার অয়েল (Castor oil) খাইতে দেওয়া যায়। এই সময়ে রোগীকে বিশ্রামে রাখিবে। পেটে একটা ফ্লানেল (Flannel) বা কলেরা-বেল্ট (Cholera Belt) বাঁধিয়া রাখিবে ও সহজে হজম হয়, এইরূপ লঘু ও তরল পথ্য দিবে। বার্লির জল, শটীর পালো, প্লাস্‌মন এরারুট (Plasmon Arrowroot), ঘোল, ছানার জল, ফলের রস প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। পথ্যটা ঈষদুষ্ণ খাইলেই ভাল। অসুখের সময়ে রোগীর পেটে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, জল মাখিয়া হাত পা সর্ব্বদা না ভিজায় বা কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম না করে, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। সাধারণ পেটের অসুখ অনেক সময় এইরূপেই যায়; কিন্তু উহা ক্ষয়জনিত হইলে সহজে উহার কিছু করা যায় না। বিশেষ সাবধানে থাকিয়া ডাক্তারের পরামর্শমত ঔষধাদি সেবন করিলে উহা

আরাম হইতে পারে। সময় সময় ডুশ্ যোগে বোরিক লোশন (Lotio acidi Borici), বা লবণ-জল (saline), বা কোন পচন-নিবারক ঔষধ দ্বারা অন্ত্রের অভ্যন্তর ধোয়াইয়া দিলে উপকার দর্শে।

কোষ্ঠ কাঠিন্য

অতিরিক্ত বাহ্যে হওয়া যেমন দোষের, বাহ্যে না হওয়াও সেইরূপ। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া কোষ্ঠ খোলসা হওয়া দরকার। একটু বেশী করিয়া জল খাইলে, বিশেষতঃ পেঁপে, কিস্‌মিস্, ন্যাসপাতী, আম প্রভৃতি খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। কাহারও প্রাতে গরম জল, কাহারও বা ঠাণ্ডা জল খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়; কাহারও শয়নকালে ঐরূপ খাইলেও হয়। যদি উহাতে না হয়, তবে মৃদু বিরেচক (Laxative) ব্যবহার করা উচিত। ক্যাস্‌কারা ইভাকুয়েন্স (Cascara Evacuans) ২০ হইতে ৬০ ফোঁটা; ক্যাসাগ্রা, (Kasagra) ২০ হইতে ৬০ ফোঁটা, প্রুনয়েড্ (Prunoid), পার্জ্জেন (Purgen), ভেজিটেবল ল্যাক্‌সেটিভ পিল (Vegitable laxative pill), চকোল্যাক্‌স (chocolax), প্রতিদিন উহাদের একটী কি দুইটী চাকতী, বা পালভ্ গ্লীসারাইজা কম্পাউণ্ড (Pulv. Glycerhiza Co.) এক চামচ লইয়া গরম জলের বা দুধের সহিত মিশাইয়া শয়নের সময়, বা ২।৪ চামচ প্যারাফিন লিকুইড্

(Paraffin Liquid) প্রভৃতি ব্যবহার করিলে সহজেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কাহারও কাহারও ফ্রুট সল্ট (Eno's fruit salt), সিড্‌লিজ্‌ পাউডার (Seidlitz powder), কাটনোজ্‌ পাউডার (Kutnow's powder) বা ক্যাস্টার অয়েলেরও দরকার হয়। সময় সময় পেটে মালিশ (massage) করিয়া দিলে উপকার হয়। কিরূপভাবে মালিশ করিতে হইবে, তাহা ডাক্তারের নিকট জানিয়া লইবে।

অনেকের কু-অভ্যাসের দরুন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। যখন বেগ হয়, তখন হয় ত পায়খানায় গেল না; বা রোজ নিয়মিত সময় গেল না। এই বিষয়ে মেয়েরা বড়ই অনিয়ম করেন। তাঁহারা একে ত সময়মত যানই না, তার উপর লজ্জার দরুনও সময়মত মলমূত্র ত্যাগ করেন না। যদি নিয়মিত সময় ভিন্ন অপর সময়ে বেগ হয়, তবে লোকে কি মনে করিবে, এই ভয়ে যাওয়া হয় না; অথবা ভোর বেলায় যদি নিকটে লোকজন থাকে, তবে তখনও নিয়মিত সময়ে যাইতে ইচ্ছা হয় না। ইহা যে শরীরের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অন্যান্য জিনিস যেমন অভ্যাসের দরুন সহজসাধ্য হয়, মলত্যাগ বিষয়েও সেইরূপ। অনেক সময় ডুশ্‌ লইলে সহজে বাহ্যে হয়। ডুশ্‌ লওয়া সম্বন্ধে বহু লোকের ভ্রান্ত ধারণা আছে; ডুশের কথা বলিলেই তাহারা ভয়ে অস্থির হয়, যেন একটা বড় অপারেশনই (operation) বা করা হইতেছে। বাস্তবিক সেরূপ কিছুই নহে। ইহা অতি সহজ ব্যাপার এবং

ইহাতে সাধারণতঃ কোন ভয়ই নাই। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে সাবধানমত বরং ডাক্তার দ্বারা দেওয়ানই সঙ্গত। ডুশ্ লইতে কয়েকটা জিনিসের উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ গরম জলে সাবান গুলিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে উহারই ডুশ দেওয়া হয়। সময় সময় উহার সহিত ১ আউন্স বা ২ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল বা অলিভ্ অয়েল (olive oil) বা পপী অয়েল (Poppy oil) দেওয়া হয়। পূর্ব্বেই তেলটা ডুশে ঢালিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া তবে সাবানজল ঢালিতে হয়। এই তেল দিবার উদ্দেশ্য গুটুলীগুলিকে ভাঙ্গিয়া বাহির করা। জলের পরিমাণ ১ পাইণ্ট বা ২ পাইণ্ট হইলেই কাজ চলিতে পারে, কখনও বা বেশী দরকার হয়। ডুশটা বেশী উঁচুতে রাখিয়া দিলে জলটা সত্বরে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু তাড়াতাড়ি যাওয়াতে অপকার ঘটিতে পারে। সুতরাং ডুশের টিন ১ ফুট, ১½ফুট উপরে রাখিয়া জল লইলেই ঠিক হইবে।

শরীর দুর্ব্বল বলিয়া যে সব অবস্থায় ডুশ দিতে আশঙ্কা হয়, সে স্থলে পিচ্কারী দ্বারা মলদ্বারে ২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম গ্লিসারিণ প্রবেশ করাইয়া দিলেই বাহ্যে পরিষ্কার হয়। গ্লিসিরিণ সাপজিটারী (Glycerine Suppository) দ্বারাও বাহ্যে করান যাইতে পারে। ইহাতে কোন আশঙ্কা নাই। ডুশ্ বা গ্লিসিরিণে নীচটাই পরিষ্কার হয়, অন্ত্রের উপরের অংশে বিশেষ কাজ করে না।

তৃতীয় অধ্যায়

ঋতুর গোলযোগ

(Menstrual Disturbances)

যক্ষ্মা-রোগের অধিকাংশ সময়েই ঋতুস্রাব খুব অল্প পরিমাণে হয়। এমন কি, সময় সময় ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ইহার জন্য পৃথক্ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেই ঋতুও নিয়মিতভাবে হইতে থাকে। সুতরাং ইহার জন্য চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। তবে যে সব স্থলে জরায়ু কিংবা ডিম্বকোষে বা ডিম্বনালীর ক্ষয়-ব্যাধি হইয়া ঐরূপ ঘটায়, তখন বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন। তখন বেদনা প্রভৃতি অন্যবিধ নানা উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে।

গর্ভাবস্থা (Pregnancy)

স্ত্রীলোক মাত্রেরই গর্ভাবস্থা একটা চিন্তা ও শঙ্কটের সময়। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যেই যখন এইরূপ, তখন যক্ষ্মারূপ গুরুতর ব্যাধির উপর গর্ভ সঞ্চার হইলে যে কতদূর ভয়ের কারণ, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। যদি ফুস্‌ফুসে ব্যাধির লক্ষণ পাওয়া যায় ও রোগ বর্দ্ধনশীল হয়, তবে গর্ভ নষ্ট করা উচিত কি না, সে

বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। যদি দেখা যায়, উহার দরুন স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তবে বিলম্ব না করিয়া ৩।৪ মাসের মধ্যেই উহা নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। এ বিষয়ে ডাক্তারদের মত লইয়া তাঁহাদের উপদেশমত কাজ করিতে হইবে। একটী জীবনাশ অতি গুরুতর কাজ—কেবলমাত্র মাতার জীবনরক্ষার জন্যই উহা করা প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং চিকিৎসকের উপর একটী গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। সর্ব্ব অবস্থায়ই অপর কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া এরূপ কাজ করা উচিত। কোন চিকিৎসকেরই এরূপ দায়িত্ব একা গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পরামর্শে যদি করাই ধার্য্য হয়, তবে তাহা যত সত্বরে হয়, তাহাই করা উচিত।

কোন স্ত্রীলোকের হয় ত এক সময়ে ক্ষয় হইয়াছিল, কিন্তু এখন সারিয়া গিয়াছে এবং ঐ অবস্থায় গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। সেরূপ স্থলে প্রসূতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। হঠাৎ পূর্ব্বেকার ব্যাধি পুনরায় দেখা দিতে পারে। বিশেষতঃ প্রসব হইবার সময় শরীরের উপর দিয়া এমন একটা ঝড় বহিয়া যায় যে, ঐ সময় রোগ দেখা দিবার বিশেষ সম্ভাবনা। প্রসব-ব্যথার দরুন ও সন্তান বাহিরে আসিবার সময় অনেকের এত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হয় যে, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। এই সব কষ্টের দরুন দেহ যেরূপ জীর্ণ হয়, তাহাতে ঐ ব্যাধি অতি সহজেই পুনরায় দেখা দিতে পারে। এই জন্য ঐ সব রোগীর জন্য বা যাহাদের যক্ষ্মা অবস্থায় গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে, অথচ উহা সময়ে

পাত করিবার সুযোগ হয় নাই, তাহাদের জন্য সাধারণতঃ দুইটী উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

১। গর্ভাবস্থার সম্পূর্ণকাল সাবধানে রাখিয়া প্রসব-ব্যথা আরম্ভ হইলে উহার প্রথম অবস্থার শেষদিকেই ক্লোরোফরম (Chloroform) দিয়া প্রসূতিকে অজ্ঞান করিয়া তাড়াতাড়ি ফরসেপস্ (Forceps) দ্বারা প্রসব করান।

২। গর্ভের পূর্ণকালের ২।১ সপ্তাহ পূর্ব্বেই ঔষধ দ্বারা বা অন্য উপায়ে প্রসব-ব্যথা উপস্থিত করাইয়া সন্তান প্রসব করান। এই উভয় উপায়েই গর্ভিণীর তত শারীরিক বা মানসিক কষ্ট হয় না এবং রোগ পুনরায় দেখা দিবার সম্ভাবনাও খুব কম হয়।

অনেক সময় হয় ত রোগিণীর অন্ত্রে বা অপর স্থানে ক্ষয় আছে এবং এমত অবস্থায় গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। এ সময়ে ফুস্ফুসের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি উহার ব্যাধি ঘটিয়া বসে, তবে পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে; নতুবা বিশেষ কিছু করিবার আবশ্যক নাই।

কোন কোন সময় দেখা যায়, যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগিণীর গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর শরীর বেশ ভাল হইতেছে ও ব্যাধির প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রসবের পর উহাদের ঐ ব্যাধি ভীষণতররূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং রুগ্না গর্ভিণীর সাময়িক পুষ্টির অবস্থা দেখিয়া কাহারও আশায় মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়।

যক্ষ্মা যাহাদের একবার হইয়া সারিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেককে বহু সন্তানের জননী হইতে না দেখা গিয়াছে, এমন

নহে; তবে ইহা নিশ্চিত যে, প্রতিবার সন্তান হওয়ার সময়ই উহা পুনরায় দেখা দিবার ভয় থাকে।

এই ব্যাধিতে গর্ভাবস্থা হইলেই যে কোন নিয়ম পালন করিতে হইবে না, তাহা নহে; বরং ঐ সব নিয়ম আরও সতর্কতার সহিত পালন করা প্রয়োজন।

যক্ষ্মা-রোগীর বিবাহ করা উচিত কি না

যক্ষ্মা-রোগীর বিবাহ করা সঙ্গত কি না, ইহা একটী গুরুতর প্রশ্ন। কেহ কেহ মনে করেন, যাহাদের একবার যক্ষ্মা দেখা দিয়াছে, তাহাদের কোন কালেই বিবাহ করা উচিত নহে। বিবাহ না করা যে সব চেয়ে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সব সময়ে উহা ঘটিয়া উঠে না। কতকগুলি অবস্থা আছে, যাহাতে কোন কোন কাজ একেবারে নিষিদ্ধ। আবার অপর কতকগুলি অবস্থা আছে, যাহাতে সে কাজগুলি না করিলেই ভাল; তবে করিলেই যে সর্ব্বনাশ হইবে, এমন কিছু নহে। যক্ষ্মা-রোগীর সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষরূপে খাটে। যক্ষ্মা-রোগের কতক অবস্থায় বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ; আবার কোন কোন অবস্থায় বিবাহ করিলে বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ দেখা যায় না। যখন ব্যাধি প্রকাশ থাকে, তখন কিছুতেই বিবাহ করা সঙ্গত নহে। এমন কি, ব্যাধি প্রবল হইয়া, ফুসফুসের ভিতরে যদি কোথাও

ক্ষত হইয়া থাকে (Cavity formation) এবং বর্ত্তমানে যদিও যাপ্য অবস্থায় দেখা যায়, তবে বিবাহ করা উচিত নহে। ব্যাধি যদি সম্পূর্ণ সারিয়া থাকে বা ২।৩ বৎসরের অধিক কাল সম্পূর্ণ যাপ্য অবস্থায় থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে বিবাহে বিশেষ কোন বাধা দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় কাহারও কাহারও একটী দেখিবার শুনিবার লোক থাকিলে বরং উপকারই হইতে দেখা যায়। তবে এ সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। যদি পুরুষের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হয়, তবে বিবাহ করা উচিত নহে। যাহাদের অর্থের অনাটন নাই, তাহাদের ত কোন ভাবনা-চিন্তাই নাই এবং বিবাহের জন্য ব্যয়-বাহুল্যের দরুন তাহাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু যাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা নাই বা সামান্য চাকুরীর উপর জীবিকা নির্ভর করে,—তাহাদের বিবাহ করিয়া ব্যয়-বাহুল্য করা এবং নিত্যনৈমিত্তিক অভাবের বোঝা বাড়াইয়া জীবনকে দুর্ব্বিসহ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যদি দুই দিন বসিয়াই থাকিতে হইল, তখন উপায় কি? নিজে না হয় হাসপাতালে যাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু যাহারা বাটীতে থাকিবে, তাহাদের চিন্তায়ই যে জীবনপাত হইবে! সুতরাং বিবাহ করিতে হইলে হাতে এমন কিছু সম্বল থাকা চাই যে, বিপদের সময়ে উহা হইতে কিছু দিনের খরচ চলিতে পারে।

এ সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদের আরও সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাহাদের সন্তানজনন জন্য শরীরের উপর দিয়া একটা বিশেষ ঝড় বহিয়া যায়। কাজেই সে কষ্ট তাহারা সহ্য করিতে সক্ষম হইবে

কি না, প্রথমেই তাহা দেখা প্রয়োজন। সুতরাং তাহাদের আরও অধিক দিন পরে, অর্থাৎ অন্ততঃ ৩।৪ বৎসর ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকিবার পর বিবাহের অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য।

এ দেশে স্ত্রীলোকের যে বয়সে বিবাহ হয়, তাহাতে অধিকাংশের বিবাহের পরবর্ত্তী সময়েই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং এই ব্যাধিতে আক্রমণ করিলে যাহাতে স্বামী স্ত্রী একত্রে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। এ দেশে এ বিষয়ে এত শৈথিল্য দেখা যায় যে, এ সম্বন্ধে গৃহকর্ত্তা ও গৃহিণাদের মনোযোগ বিশেষরূপে আকর্ষণ করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ রোগের উপর গর্ভ হইলে স্ত্রীলোকের অবস্থা যে কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এইরূপ ব্যাধি হইলে বধূকে অবিলম্বে পিত্রালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা, অথবা যাহাতে স্বামী-স্ত্রী একত্রে না থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহের অব্যবহিত পরেই অনেক স্ত্রীলোককে এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। উহার কারণ আর কিছুই নহে,—একমাত্র কঠোর অবরোধ-প্রথা। পিত্রালয়ে থাকিতে মেয়েরা তবু আলোক ও বাতাসের মুখ দেখিতে পায়,—কিন্তু নব-বধূরূপে স্বামিগৃহে আসিয়া সর্ব্বদা গৃহকোণে আবদ্ধ ও অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকাতে আলো-বাতাসের সহিত সম্পর্ক একরূপ থাকে না, ফলে তাহাদের

অনেকেরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং পরিশেষে যক্ষ্মা আসিয়া আক্রমণ করে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশবাসীর দৃষ্টি এ দিকে একেবারেই নাই। আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, এই মূল্যবান্ জীবনগুলি অকালে নষ্ট হওয়ার জন্য আমরা কতদূর দায়ী!

যক্ষ্মা-রোগীদের বিবাহ সম্বন্ধে আরও একটী আপত্তি সময় সময় উত্থাপিত হইয়া থাকে যে, উহাদের সন্তান-সন্ততিগণেরও যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ঐরূপ বিবাহ অবিধেয়।

কিন্তু যেরূপ অবস্থায় ইতঃপূর্ব্বে বিবাহের সমর্থন করা গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সন্তান-সন্ততির বড় একটা যক্ষ্মা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পিতামাতার কাহারও মধ্যে যদি যক্ষ্মা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সন্তানে উহা সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে; হইলেও উহা পিতামাতার নিকট বাস করার দরুনই প্রায় ঘটিয়া থাকে। কারণ, চারিদিকে ক্ষয়-বীজাণুপূর্ণ থুতু এবং তৎসম্পর্কিত জিনিসপত্র থাকাতে সন্তানের ক্ষয় হওয়া অসম্ভব নহে। তবে এরূপ অবস্থায় শুধু সন্তান কেন, আর যে-কেহ সর্ব্বদা সংশ্রবে আসিবে, তাহারই ঐ একই কারণে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদি আক্রমণের দুই হইতে চারি বৎসর পর পর্য্যন্ত যক্ষ্মার কোন লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিতে বাধা নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

পথ্যাপথ্য

যক্ষ্মা-রোগীর পথ্য বিশেষ বিবেচনার সহিত নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই রোগে যে দারুণ ক্ষয় হয়, তাহার পূরণ একমাত্র খাদ্য দ্বারাই হইতে পারে। এই ব্যাধিতে হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিও কঙ্কালসার হইয়া পড়ে। কোন কোন সময় এই ক্ষয় অতি দ্রুত হয়; আবার কখনও এত ধীরে হয় যে, রোগী নিজেই তাহার ক্রমদৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারে না। আজকাল আমরা নূতন নূতন ঔষধের মোহে, স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার যাদুতে, বিশ্রাম ও আলোক-বায়ুর উপকারিতার কথা লইয়া এতই তন্ময় থাকি যে, গোড়ার যে প্রধান কথা, সেই সম্বন্ধেই সব ভুলিয়া যাই। যতই আলোক-বায়ু দাও, যতই বিশ্রামে রাখ, বিশুদ্ধ পুষ্টিকর আহার্য্য পেটে না পড়িলে ও উহা রীতিমত হজম না হইলে কিছুতেই ক্ষয়রোগীর শরীরের উন্নতির আশা করা যায় না। সুতরাং আহার্য্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তবে বিশ্রাম প্রভৃতিতে উপকার যে না হয়, তাহা নহে। বিশ্রামে থাকিলে শক্তির অপচয় হয় না বলিয়া দেহ-সংরক্ষণে খাদ্য বিশেষ সহায়তা করে। ঐরূপ নির্ম্মল বায়ুও শরীরের সাধারণ উন্নতিবিধান করিয়া পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করে এবং স্যানাটোরিয়ামের

সাধারণ কথা

শিক্ষাবলী জীবনকে নিয়মিত করিয়া এবং যথাসময়ে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া হজমের সহায়তা করে। সুতরাং ঐ সকলও আবশ্যকীয়। তবে দেহের ক্ষয় নিবারণের প্রধান উপায়ই খাদ্য। কেবল খাদ্য হইলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে উহা পরিপাক করিবার ক্ষমতাও থাকা চাই। এই খাদ্য যেমন শরীর রক্ষার প্রধান সহায়ক, তেমনি ইহাই যদি প্রকৃত অবস্থা না বুঝিয়া যথেচ্ছভাবে দেওয়া যায়, তবে পরিপাক-শক্তি নাশ করিয়া শরীর সমূলে ধ্বংস করে। যক্ষ্মা-রোগীর উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন যেমন-তেমন ব্যাপার নহে। প্রত্যেক রোগীর অবস্থায় যেমন কিছু কিছু প্রভেদ দেখা যায়—উহাদের খাদ্যও তদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ হইবে। সকলের খাদ্য একই উপায়ে নির্ব্বাচন করিতে গেলে কখনও সুফল দেখা যায় না। এই জন্য অনেক হাঁসপাতালে ও স্যানাটোরিয়ামে সকলের আহার্য্য একইরূপ হওয়ায় সকলের সমান উপকার হইতে দেখা যায় না, বরং অনেকের অনিষ্ট ঘটে। যক্ষ্মাগ্রস্ত সকল রোগীর পথ্য কখনই একরূপ হইতে পারে না; সুতরাং প্রত্যেক রোগীর অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া তাহার আহার্য্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সকল রোগীর অবস্থা সমান নহে। যাহাদের অর্থের বল আছে, তাহাদিগকে যত মহার্ঘ খাদ্যই ব্যবস্থা করা হউক, তাহারা অনায়াসে তাহা কিনিয়া খাইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ খাদ্য সামান্য গৃহস্থ বা দরিদ্র রোগীর জন্য ব্যবস্থা করিলে, তাহাদের সাধ্য কি, যে পারিয়া উঠে! সুতরাং প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থার বিষয়

বিবেচনা করিয়া পথ্য নির্দ্দেশ করা উচিত। অনেক সময় দেখিতে পাই, স্যানাটোরিয়ামে যাইয়া এক জন বেশ সারিয়া মোটাসোটা হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আইসে, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ব্যাধিতে পুনরায় আক্রান্ত হয়। উহার কারণ আর কিছুই নহে, তথায় হয় ত তাহার সাধ্যাতীত ভাল ভাল খাদ্য সে খাইতেছিল, কিন্তু বাটী আসিয়া উহা সংগ্রহ করিতে না পারায় তাহার শরীর পুনরায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুতরাং স্যানাটোরিয়ামগুলিও ধনী ও দরিদ্রের জন্য পৃথক্ পৃথক্ থাকা উচিত এবং উহাতে পৃথক্ পৃথক্ বন্দোবস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

যেমন আর্থিক অবস্থার বিষয়, সেইরূপ প্রত্যেকের শরীরের অবস্থার বিষয়েও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কাহারও শরীর স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ থাকে: আবার কাহারও স্বভাবতঃই কৃশ থাকে। ব্যাধি হওয়ার পূর্ব্বে কাহার কিরূপ ওজন ছিল, শরীরের কিরূপ ক্ষয় হইয়াছে, কাহার হজমের অবস্থা কিরূপ, কেহ হয় ত স্বভাবতঃই অল্পাহারী, কেহ হয় ত বেশী আহার করে,—এ সকল বিষয়ের খোঁজ বিশেষরূপে লইয়া তবে পথ্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রী-পুরুষ ভেদেও খাদ্যের তারতম্য হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই স্বল্পাহারী, সুতরাং যদি উভয়ের ব্যাধির একইরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলেই যে উভয়ের খাদ্যও একইরূপ হইবে, তাহা নহে। পুরুষের হয় ত বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হইবে।

আজকাল যক্ষ্মা-রোগে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাওয়ান (Forced feeding) একটা ফ্যাশনের (fashion) মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

সমস্ত অবস্থা বিবেচনা না করিয়া এক দিক্ হইতে যদি কেবল খাওয়ানই যায়, তবে পরিপাক-শক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়া কুফল ফলে। সকলের হজম-শক্তি ত সমান নহে। কাহার কতটা হজম হয়, সেই অনুসারে আহার্য্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কেহ হয় ত স্বভাবতঃই বেশী খায়, কেহ হয় ত অপেক্ষাকৃত কম খায়। সুতরাং একই পথ্য একজনের নিকট লঘু, অপরের পক্ষে হয় ত উহা গুরুপাক। কাজেই দেখিতে হইবে, কতটা কম খাইয়া শরীর রক্ষা হইতে পারে। ঐরূপ খাইয়াই যদি দেহের উন্নতি হয়, তাহা হইলে খাদ্য আর বাড়াইবার প্রয়োজন হয় না। যদি উহাতে কোন উপকার না দেখা যায় এবং খাদ্য বাড়াইলে পরিপাক-শক্তির কোন গোলযোগ না হয়, তবে খাদ্য বাড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত। এইরূপে দরকার হইলে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যও দেওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ অবস্থায়ই উহাতে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

আহার্য্য সামগ্রী ভালরূপে রন্ধন না হইলে মুখরোচক হয় না। সুতরাং রোগীর পথ্যাদি যাহাতে তৃপ্তিদায়ক হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এখানেও ধনী দরিদ্র অনুসারে পথ্যের তারতম্য হইয়া থাকে। ধনীর যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই আনিয়া হাজির করিতে পারা যায় এবং নানারূপ সুগন্ধ মসলাযোগে আহার্য্যকে উপাদেয় করিতেও পারা যায়। দরিদ্রের তাহা ঘটে না। তবে উহারই মধ্যে যাহাতে আহার্য্যগুলি সুগন্ধ ও সুস্বাদু হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আর একটী কথা। চিকিৎসকেরা যেমন ঔষধাদি সম্বন্ধে সঠিক উপদেশ দেন, আহার্য্য সম্বন্ধে তাহা করেন না। এই ব্যাধিতে আহার্য্য সম্বন্ধেও ঐরূপ ধরাবাঁধা উপদেশ দেওয়া সঙ্গত। চিকিৎসক হয় ত বলিয়া যান—"দুধটা খুব বেশী করিয়া খাইও, তরকারী মাছ খাইতে পার, মাঝে মাঝে মাংস খাইবে, তা' ডিমও চলিতে পারে, ফল প্রভৃতিও খাইতে পার,—" ইত্যাদি। কিন্তু কোন্‌টা কখন খাওয়া প্রয়োজন, কোন্‌টা কি পরিমাণে খাওয়া দরকার, উহার কোন্‌টা কিরূপে রন্ধন করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে কোন উপদেশই দেন না। যক্ষ্মা-রোগীর দৈনন্দিন জীবনযাপন বিষয়ে এই সমস্ত কথা সঠিক নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া চিকিৎসকের একান্ত কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মা-রোগের সকল অবস্থাতেই যে একরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা নহে। ব্যাধি যতই অগ্রসর হইতে থাকে, খাদ্য সম্বন্ধে ততই সাবধান হইতে হয়। তবে এই ব্যাধিতে খাওয়াইতে না পারিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। অন্যান্য ব্যাধিতে যেমন দুই দিন লঙ্ঘন দিয়া থাকিলে বিশেষ কিছু যায় আসে না, ইহাতে তাহা নহে। শরীরের নিত্যই এত ক্ষয় হয় যে, তাহা পূরণ করিবার জন্য যতদূর সাধ্য উপায় দেখা কর্ত্তব্য। বেশী জ্বর হইয়া পড়িলে বা নানারূপ উপসর্গ দেখা দিলে, পথ্য বিশেষ সাবধানমতই দেওয়া আবশ্যক। তাই বলিয়া হয় ত রোজ বিকালে একটু একটু জ্বর হইতেছে দেখিয়া ভাত প্রভৃতি বন্ধ করিলে চলিবে কেন? দেখিতে হইবে, ভাত খাইলে জ্বর বৃদ্ধি

হয় কি না? যদি তাহা না হয়, তবে ভাত দিতে বাধা দেখি না। সুতরাং এক কথায়, ক্ষয়-রোগীকে সহ্য হইলে যত অধিক পথ্য দেওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নানারূপ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবে রোগী তন্মধ্যে যেটা অধিক ভালবাসে, তাহাকে তাহাই খাইতে দিবে। নানাবিধ সুস্বাদু ফল, নানারূপ নির্দ্দোষ চাট্‌নি প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে। এই সকলের সাহায্যে রোগী যাহাতে তৃপ্তির সহিত কিছু আহার করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তাই বলিয়া স্বভাবতঃ যাহা গুরুপাক, যাহা সুস্থ শরীরে খাইলেও প্রায়ই অসুখ হয়, এরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। চিংড়ী মাছ, ইলিস মাছ, ছোলার ডাল, পোলাও, ভুনী খিচুড়ী প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য ক্ষয়-রোগীকে খাইতে দেওয়া কদাচ সঙ্গত নহে। যাহা লঘুপাক অথবা বলকারক, এইরূপ খাদ্য যে পরিমাণ রোগী অনায়াসে পরিপাক করিতে পারে, তাহাকে খাইতে দিবে।

কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই একমাত্র দুগ্ধ খাইয়া কিছুদিনের জন্য জীবন ধারণ করিতে পারে। সকলের পক্ষে এমন সুন্দর বলকারক পথ্য আর নাই। ইহার কিছুই ফেলা যায় না এবং ইহা দুর্ম্মূল্যও নয়।

দুগ্ধ

প্রটিড্ (Protied) ও মাখনজাতীয় পদার্থ (Fat), যাহা আমাদের দেহের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী, তাহা ইহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। ইহার আর একটী প্রধান গুণ এই যে, ইহা সকলেই বিনা আপত্তিতে খাইয়া থাকে। ইহা যাহাতে খাঁটি পাওয়া যায়,

তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। সহরের অধিকাংশ দুগ্ধেই ভেজাল থাকে এবং তাহা হইতে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

যক্ষ্মা-রোগীরা সাধারণতঃ দুধ খাইতে চাহে না। খাইলে যে তাহাদের হজম হয় না, তাহা নহে। উহার উপর অনেকের কেমন একটা বিতৃষ্ণার ভাব থাকে। সুতরাং চেষ্টা করিয়া সেই ভাব দূর করিতে হইবে। যদি একান্তই খাইতে না চায়, তবে না হয় ২।১ চামচ করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় বা ২ ঘণ্টা অন্তর আরম্ভ করা যায়। এইরূপে বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে বেশী দুধ খাইতেও আপত্তি করে না। ১½ সের ২ সের পর্যান্ত দুধ চেষ্টা করিলে অবাধে দেওয়া যাইতে পারে। দুধ সাধারণতঃ ঈষদুষ্ণ খাওয়া উচিত। ঠাণ্ডা দুধ খাইলে সময় সময় উদরাময় হয়। দুধ খাওয়ার পর মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে পারে। দুধের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে এই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইতে পারে। উদরাময় হইলে দুধের সহিত বার্লির জল, চূণের জল, সোডাওয়াটার বা গুঁড়া সোডা মিশাইয়া দিলে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

এমন লোকও দেখা যায়, যাহাদের দুধ একেবারেই সহ্য হয় না। তাহাদিগকে উহা জোর করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। তাহাদিগকে সময় সময় দুধ হইতে প্রস্তুত অন্যান্য দ্রব্যও খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। ঘোল একটী উপাদেয় খাদ্য—অবস্থা-বিশেষে গৃহজাত দধিও দেওয়া যাইতে পারে। ছানা হজম হইলে উহাও বিশেষ বলকারক খাদ্য। ছানাজাত সন্দেশাদি অবস্থা-বিশেষে দেওয়া যায়।

যক্ষ্মা-রোগে মাখনজাতীয় পদার্থ একটী প্রশস্ত ও উপাদেয় খাদ্য। আমাদের দেহের যখন ক্ষয় আরম্ভ হয়, তখন দেহে প্রথমে এই মাখনজাতীয় বা চর্ব্বীজাতীয় পদার্থেরই (fats) লোপ হইতে থাকে, সুতরাং দেহের পুষ্টির জন্য ইহার একান্ত আবশ্যক। ইহা প্রায়ই সুস্বাদু ও সহজ ব্যয়সাধ্য। অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলেও অধিকাংশ সময়েই সহ্য হয়। তবে সময় সময় এই চর্ব্বী-জাতীয় জিনিষ এত বেশী দেওয়া হয় যে, হজমের গোলযোগ জন্মাইয়া দেয়। এমন কি, উদরাময় পর্য্যন্ত হয়। এরূপ অবস্থায় উহা কয়েক দিনের মত স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। এই চর্ব্বীজাতীয় জিনিষের মধ্যে মাখন ও ক্রীম খুব প্রশস্ত। দুধের মধ্যে, ডিমের মধ্যে ও মাংসের মধ্যে চর্ব্বীর ভাগ আছে। মাংসের গ্রন্থিগুলিতে (Joints.), খাসীর, ভেড়ার, শূয়োরের ও মুরগীর মাংসে বেশ চর্ব্বী আছে। কতক কতক মাছেও খুব চর্ব্বী আছে। তৈলাক্ত মাছগুলিই চর্ব্বীযুক্ত। ভাঙ্গন, খসল্লা, কৈ, টাঁই ও চিতল মাছের কোল প্রভৃতি খুব তৈলাক্ত। এই চর্ব্বীর জন্যই কড মাছের তৈল এই ব্যাধিতে এত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং উহাতে যে কত লোকের উপকার হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

মাখনজাতীয় পদার্থ (fats)

আজ কাল কড্‌লিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে অলিভ অয়েল (জলপাই তৈল), পেট্রোলিয়ম্ (কেরোসিন জাতীয়), কটন সীড অয়েল (তুলা বীচির তেল) প্রভৃতি সস্তা ও একইরূপ

উপকারী বলিয়া প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। সময় সময় মাখন সহ্য হয় না, অথচ ঘি বেশ সহ্য হয়। তৈলও ইহারই অন্তর্গত। এই সব কারণে তৈলাক্ত কতকগুলি ফলও এই ব্যাধিতে বিশেষ উপকারী; যথা—বাদাম, আখরোট, পেস্তা প্রভৃতি।

যক্ষ্মা-ব্যাধিতে ডিম ব্যবস্থা করা একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ডিমের মধ্যে মূল্যবান্ পদার্থ আছে সত্য, কিন্তু সকল অবস্থায় উহার ব্যবস্থা সঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ডিমের ভিতর সাদা ভাগের সবটাই প্রায় প্রটিড্, আর হলুদে ভাগের মধ্যে প্রটিড্ ও চর্ব্বী আছে। সুতরাং উহা হইতে একাধারে আমরা প্রটিড্ ও চর্ব্বী পাই এবং উভয়ই শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে দিনে ৮।১০টা ডিম খাওয়ার ব্যবস্থা একটা বেশী কিছু নহে। অনেক সময় উহার অধিকও দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অত ডিম প্রায় কাহারও সহ্য হয় না। দিনে ৩।৪টা ডিম খাইলেই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। আর সহরে ডিমের যেরূপ দর, তাহাতে ৩।৪টা ডিম দৈনিক খাওয়া যেমন-তেমন কথা নয়, উহা হইতে অল্প ব্যয়ে অন্য ভাল খাদ্য চলিতে পারে। বেশী ডিম অনেকেরই সহ্য হয় না। উহাতে প্রায়ই পিত্তের গোলযোগ হইয়া বদ-হজম হয়। উহার কারণ, ডিমের হলুদ অংশের মধ্যে যে চর্ব্বীজাতীয় জিনিস আছে, উহা সব সময়ে টাটকা থাকে না।

ডিম

ডিম খাইতে হইলে উহা সদ্য (freshly laid) হইলে

ভাল হয়। সদ্য ডিম সহরে পাওয়ার আশা কম। ডিম যত বেশী দিনের হইবে, ততই খারাপ হইয়া হজমের গোলযোগ ঘটাইবে। হাঁসের ডিম অপেক্ষা মুরগীর ডিম প্রশস্ত; কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুই মুরগীর ডিম খান না। তাঁহাদের পক্ষে সদ্য হাঁসের ডিম না পাইলে উহা ত্যাগ করাই ভাল।

ডিম নানা উপায়ে খাওয়া যাইতে পারে। কাঁচা খাইতে পারিলে বেশ সহজে হজম হয়। এক স্থানে একটি ছিদ্র করিয়া আস্তে আস্তে একটা চায়ের বাটিতে বা কাচের গ্লাসে ঢালিবে। উহার উপরিভাগে একটু জল বা একটু ব্রাণ্ডি অথবা একটু দুধ ঢালিয়া খাইলে বিস্বাদ লাগিবে না। অনেকে এমনিই বেশ খায়।

ডিম দুধের সহিত ফেটাইলে বিস্বাদ লাগে; কিন্তু ব্রাণ্ডির সহিত ফেটাইয়া একটু পেপারমিণ্টের জল সহ খাইলে মন্দ লাগে না। আমাদের দেশে ব্রাণ্ডি অপ্রশস্ত মনে করি। কিছুকাল গরম জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া (half boiled) একটু সামান্য জমিলে নুন ও তৎসহ একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়া খাইতে মন্দ লাগে না। রুটীর সহিত মাখাইয়াও খাওয়া যায়। ডিমকে ফুটন্ত ঘিয়ের মধ্যে ছাড়িয়া, উঠাইয়া লইলেও মন্দ লাগে না (Egg poach)। আমাদের দেশে যেরূপ সিদ্ধ করিয়া, ভাজিয়া বা তরকারী রাঁধিয়া ডিম খাইবার প্রথা আছে বা নানারূপ সুস্বাদু করিয়া উহা রন্ধন হয়, রোগীর পক্ষে তাহা একান্ত অপকারী।

মাছের ভিতর প্রেটিড্ জাতীয় জিনিস থাকাতে এবং কতকগুলিতে চর্ব্বীজাতীয় উপাদান থাকাতে পথ্যের হিসাবে উহা উপকারী। কথায় বলে "মাছ ভাতে বাঙ্গালীর প্রাণ" সুতরাং মাছ না হইলে খাওয়াই যেন হয় না। এই মাছ সদ্য ধৃত হইলে ভাল হয়। কৈ, মাগুর, সিঙ্গী মাছ প্রভৃতি ত মামুলী আছেই। উহা ভিন্ন ছোট চুনা মাছ, ছোট রুই (পোনা), ভাঙ্গন, কাজুলী, রায়েগ, টেংরা, গোলসা, পাবদা, ভেটকী, বাচা, শিলং, নন্দন, খলসে, মৌরলা, পার্শী, ছোট কাৎলা, ছোট মৃগেল প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে খাওয়া যাইতে পারে। চিংড়ী, বোয়াল, ইলিস, সোল, প্রভৃতি গুরুপাক মৎস্য ভোজন করা উচিত নহে।

মৎস্য

আমাদের দেশে সাধারণের পক্ষে মাংসটা নিত্য-নৈমিত্তিক খাওয়ার মধ্যে নহে। হিন্দু জমাদার, মুসলমান ধনী ও জমীদার এবং ইদানীং বিলাত-প্রত্যাগত দেশীয়দের মধ্যে মাংস বিশেষ প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন জনসাধারণ মাংসের বড় একটা ধার ধারে না। হিন্দুরা যে সামান্য মাংস খায়, তাহাতে উহাদিগকে মাংসভোজী না বলিলেও চলে। সুতরাং এ দেশে মাংসের ব্যবস্থা বিশেষ বিবেচনার সহিত করা কর্ত্তব্য। সহরে না হয় মাংস অল্প-বিস্তর কিনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মফস্বলে ও পল্লীগ্রামে উহা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। মুসলমানদের একটী ক্ষুদ্র মুরগী জবাই করিলেই চলিতে

মাংস

পারে। কিন্তু হিন্দুদের একটা পাঁঠা, খাসী বা ভেড়া না কাটিলে মাংস খাইবার উপায় নাই। হাঁসের মাংস অনেকেরই সহ্য হয় না। মাংসের ভিতর প্রটিড্ ও চর্ব্বী উভয়ই আছে, তবে প্রটিড্ই বেশীর ভাগ। কাজেই উহা যে উপকারী খাদ্য, তাহার মধ্যে সন্দেহ নাই। যাহাদের প্রধান খাদ্যই মাংস, তাহাদের মধ্যেই আজকাল উহা বেশী খাওয়া উচিত কি না, তাহা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ বলেন, রোগীকে উহা তিনবার দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। রোগে হজম-শক্তি যেরূপ ক্ষীণ হয়, তাহাতে বেশী মাংস খাইতে দিলে পরিপাকের গোলযোগ ঘটিবারই সম্ভাবনা। সুতরাং তাঁহারা দিনে একবার মাত্র মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ দেশীয়-গণের মধ্যে যাহাদের প্রত্যহ মাংস খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাহাদিগকে একবার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্যের পক্ষে মাঝে মাঝে দিলেই চলিতে পারে। সপ্তাহে দুইবার করিয়া দিলে, কি অবস্থাবিশেষে ১ দিন অন্তর ১ দিন দিলে চলিতে পারে। হিন্দুরা ত পাঁঠা, ভেড়া বা খাসীর মাংস ছাড়া বড় একটা কিছু খান না। ব্যাধির সময় আজকাল দেখিতে পাই, মুরগীর মাংস প্রায় চলিত হইয়াছে। হাঁসের মাংস গুরুপাক। মুসলমান-গণের জন্যও গোমাংস এ দেশে তত সুবিধাজনক মনে হয় না। ছোট মুরগী বা কচি পাঁঠা প্রভৃতিই ভাল। অধিক মসলা বা বেশী ঘি তৈল যোগে মাংস রান্না করা উচিত নহে। মাংসের সহিত আলু পেঁয়াজ প্রভৃতি অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে, না দিলেও ক্ষতি নাই। মাংসের ষ্টু (stew) এই সব অবস্থায়

মন্দ নহে। ইক্-মিক্ কুকারে মাংস রাঁধিলে উহা বেশ সুপাচ্য ও সুখাদ্য হয়। যে সব অবস্থায় মাংস সহ্য হয় না—সেখানে মাংসের জুস বা সূপ দেওয়া যাইতে পারে।

কবুতর, মুরগী বা কচি পাঁঠার সূপ (soup) ভাল। অবস্থাবিশেষে কাঁচা মাংসের রস (raw meat juice) দেওয়া যাইতে পারে। চর্ব্বিবিহীন ভাল মাংস হাড় হইতে ছাড়াইয়া লইয়া যন্ত্রসাহায্যে চাপ দিয়া উহার রস নির্গত করা হয়। উহা অতি সহজপাচ্য ও বলকারী। এই রকম ১ আউন্স হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনিক ৩।৪ আউন্স পর্য্যন্ত দেওয়া যায়।

শর্করা জাতীয় জিনিস (Carbo-hydrate).

এই শ্রেণীর মধ্যে আমাদের উপযোগী সর্ব্বপ্রধান খাদ্য ভাত। জ্বর কম থাকিলে ভাত খাইতে কোন বাধা নাই। যাঁহাদের প্রধান খাদ্য রুটী, তাঁহারা ময়দার, আটার বা সুজির রুটী খাইতে পারেন। পাউরুটি বা লুচিও সময় সময় দেওয়া যাইতে পারে। প্ল্যাস্‌মন (Plasmon), ওট্‌মিল্ (Oatmeal), প্ল্যাস্‌মন ওটস্ (Plasmon oats), বার্লি, এরারুট, সাগু, শটী, প্ল্যাস্‌মন এরারুট (Plasmon Arrowroot) প্রভৃতিও এই শর্করাজাতীয় খাদ্য। এই সব দিয়া দুগ্ধ সহযোগে বা অন্য উপায়ে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য তৈয়ারী করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল সহজে হজম হয়, অথচ বলকারী।

তরকারীর মধ্যেও এই শর্করার উপাদানই বেশী। যে কালের

যে তরকারী, তাহাই বিশেষ উপকারী। তরিতরকারী বেশ

তরি-তরকারী।

তাজা হওয়া চাই। পটোল, বেগুন, সীম, উচ্ছে, কচি থোর, কাঁচকলা, কচি কুমড়ো, কচি ঝিঙ্গা, ভাল ওল, ভাল কচু, ডুমুর, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা শশা, ফুলকপি, কচি ডাঁটা ও ওলকপি প্রভৃতি বেশ উপকারী। আলু অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। মটরশুটি, বীন (Bean) প্রভৃতির ভিতর প্রটিড্ থাকায় উহা উত্তম খাদ্য। এই সকলের সূপ করিয়া খাইলে বেশ উপকার হয়। কচি লাউ ও কচি মিট্‌কুমড়া অল্প পরিমাণে খাওয়া যাইতে পারে। কুমড়ার ডাঁটা, পুঁই ডাঁটা প্রভৃতি তরকারীতে দিয়া চিবাইয়া ফেলিতে পারা যায়। শাক, পাকা কুমড়া, বাঁধা কপি, বীট, মূলা, গাজর, সালগম প্রভৃতি দুষ্পাচ্য; সুতরাং ঐ সকল না খাওয়াই সঙ্গত।

ফলগুলি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ প্রটিড্ ও শর্করাজাতীয় জিনিস আছে। সময়ানুযায়ী ও সুপক্ক

ফলাদি :

ফলই ভাল। ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর, আনারস, পেঁপে, আম, পীচ্, আপেল, ন্যাসপাতী, কমলালেবু, মাঙ্গোষ্টিন (Mangostein), পানিফল, কেশুর প্রভৃতি সুখাদ্য ও উপকারী।

কাঁঠাল, বাঙ্গী, তরমুজ, ক্ষীরা, লিচু প্রভৃতি প্রায়ই পেটের গোলযোগ ঘটায় এবং এগুলি না খাওয়াই উচিত। কলা সকলের সহ্য হয় না। বাদাম, পেস্তা, খেজুর, আখ্‌রোট, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি

বলকারক ও কোষ্ঠপরিষ্কারক। শাকসব্জী ও ফলে ভাইটামিন (Vitamin) থাকাতে উহা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

চা প্রভৃতি

অনেকের চা প্রভৃতি খাওয়া এমন অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায় যে, উহা ছাড়াইলে চলে না। সুতরাং একবার দুইবার চা, কাফি বা কোকো দেওয়া যাইতে পারে। যদি সহ্য না হয়, তবে বন্ধ করিবে। অধিক দুগ্ধের সহিত অল্প পরিমাণে ঐ সব জিনিস মিশাইয়া হাল্‌কা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন চকোলেট্ (Chocolate), নানাপ্রকারের বিস্কুট, দু'এক সময়ে সহজপাচ্য কেক্ (Cake), স্যাণ্ডউইচ প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

মিঠাই

অল্প পরিমাণে সন্দেশ, রসগোল্লা, মোহনভোগ, লুচি, নিম্‌কি প্রভৃতি সদ্য তৈয়ারী হইলে এবং কোনরূপ ভেজাল না থাকিলে খাইতে দেওয়া চলে।

চাটনী

লেবুর আচার, আমলকীর আচার, পুরাণ তেঁতুলের আচার প্রভৃতি সামান্য একটু করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, বরং মুখরোচক বিধায় পরিপাকের সহায়তা করে।

পঞ্চম অধ্যায়

চিকিৎসা-প্রণালী

চিকিৎসা বিষয়টি যে অতি গুরুতর এবং বিশেষজ্ঞগণের কার্য্য, এ সম্বন্ধে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু বলিয়াছি ; সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চিকিৎসা বলিতেই আমরা সাধারণতঃ ঔষধের প্রয়োগ মাত্র বুঝিয়া থাকি ; কিন্তু বাস্তবিক চিকিৎসা তাহা নহে। ঔষধ-প্রয়োগ চিকিৎসার নানাবিধ উপায়ের একটী উপায় মাত্র। যে-কোন উপায় দ্বারা অসুস্থ দেহকে সুস্থ অবস্থায় আনা যায়, উহাই দেহের চিকিৎসা। সুতরাং কি কি প্রণালী অবলম্বন করিলে এই যক্ষ্মারোগ নিবারিত হইয়া দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, আমরা এ স্থলে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। এই ব্যাধি কখন সহজ ভাবে, কখন কঠিনরূপে, কখনও বা অন্য ব্যাধির সহকারিরূপে প্রকাশ পায়। এই সকল বিষয় মনে রাখিয়া বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক উহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। চিকিৎসা মাত্রেই নানারূপ উপস্থিত-বুদ্ধির ও চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন ; বিশেষতঃ এইরূপ গুরুতর ব্যাধিতে, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাতে জীবন-মরণের খেলা, তাহাতে চিকিৎসককেও রোগীর সামান্য উপশমের জন্য, তাহার কণামাত্র শান্তির জন্য কতদূর চিন্তা, নিত্যই কত নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিতে

হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কোন ধরাবাঁধা নিয়মে এই ব্যাধির চিকিৎসা একেবারেই চলে না। তবে মোটের উপর যদি কোন একটামাত্র কথায় এই চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারা যায়, তবে তাহা রোগীর দেহের **বলরক্ষা**; যে কোন উপায়ে রোগীর বলরক্ষা বা বলসঞ্চার করা যায়, তাহাই হইল ইহার প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা।

আমরা পূর্ব্বে যে সব আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ক্ষয়-জীবাণু এই ব্যাধির মুখ্য কারণ। সুতরাং—

(১) যে সমস্ত উপায়ে ক্ষয়-জীবাণুর ধ্বংস বা নিগ্রহ হয়, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বদাই করা উচিত। ইহাদের বিনাশের জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা হইয়া থাকে ঃ—

(ক) যে সকল পচন-নিবারক ঔষধ (Antiseptics), এই জীবাণু ধ্বংস করে, আমরা নানাবিধ উপায়ে তাহা দেহে প্রবেশ করাইয়া দিই। বিশেষতঃ শ্বাসের সহিত আমরা কতকগুলি ঔষধ বাষ্পাকারে (spray) শ্বাসনালীর ভিতর দিয়া বরাবর ফুস্‌ফুসে পৌঁছাইয়া দিতে চেষ্টা করি। আমাদের এই আশা যে, উহারা ফুস্‌ফুস্‌স্থিত ক্ষয়-জীবাণুর সংযোগে আসিয়া ইহাদিগকে ধ্বংস করিতে ও ব্যাধি নিবারণ করিতে সহায়তা করিবে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা ক্রিয়োজোট (Creosote), টিংচার আইডিন (Tin. Iodine), কার্ব্বলিক এসিড (Carbolic acid),

ইউক্যালিপ্টাস্ অয়েল (Eucalyptus oil) প্রভৃতি জিনিস কখনও অবিমিশ্র অবস্থায় বা কখনও মিশ্রিত অবস্থায় শ্বাসের সহিত বাষ্পাকারে টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করি অথবা যন্ত্র সহযোগে গ্রহণ করি। দেহের বহির্ভাগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ইহারা এই জীবাণু ধ্বংস করে সত্য, কিন্তু জীবন্ত মানুষের ভিতর যাইয়া কতদূর কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা সঠিক বলা কঠিন। কতকটা কাজ যে না হয়, তাহা নহে ; কিন্তু যতটা আশা করা যায়, ততটা যে করে না, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

(খ) এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই অপর কতকগুলি ঔষধ খাইতে দেওয়া হয় ; যথা—থিওকল্ (Thiocol), গোয়েকল্ (Guiacol). আইডোফরম্ (Iodoform), ক্রিয়োজোট (Creosote) প্রভৃতি। উদ্দেশ্য, ইহারা দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া জীবাণুর উপর কার্য্য করিবে এবং উহার ধ্বংসে সহায়তা করিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাতেও আশানুরূপ ফল প্রসব করে না।

(গ) টিউবার্কিউলিন চিকিৎসা—ইহা সূচযোগে ক্রমিক বর্দ্ধিত মাত্রায় ত্বকের নীচে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় (Hypodermic injection)। এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীবাণুকে ধ্বংস করিবার দেহের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, এই চিকিৎসা দ্বারা সেই শক্তিকে বর্দ্ধিত করাই উদ্দেশ্য। টিউবার্কিউলিন সম্বন্ধে আমরা অপর স্থানে আলোচনা করিব। কাজেই এখানে সবিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। বিষয়টী বড় জটিল এবং এই চিকিৎসা করিতে হইলে এই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের

প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের হাতে অবস্থাবিশেষে ইহার দ্বারা অশেষ উপকার হইয়াছে।

(ঘ) নির্ম্মল বায়ু ও সূর্য্যের কিরণ এই জীবাণু বিনাশে প্রধান সহায়ক। সুতরাং যাহাতে ইহাদের প্রচুর ব্যবস্থা হয়, তাহাই করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই কারণেই বর্ত্তমানে রৌদ্র স্নানের (Sun bath) এত ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

(ঙ) যে কোন উপায়ে দেহের বল বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই ক্ষয়-জীবাণুকে নিস্তেজ করে। সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয়।

(চ) ক্ষয়-জীবাণুগুলি যাহাতে ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হইতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। শত্রু যত কমিয়া যায়, ততই মঙ্গল। কাশির সহিত গয়ের উঠিতে দেওয়াই উচিত। একটু কাশি হইলেই কাশি বন্ধ করা উচিত নহে। সকল জিনিসেরই অবস্থা-ভেদে উপকারিতা আছে। তবে কাশি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কষ্ট-দায়ক হইলে, উহার উপশমের চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য।

(ছ) নানাবিধ উপায়ে শরীরের উন্নতি বিধান করিয়া ক্ষয়-রোগ দূর করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ক্ষয়-রোগের চিকিৎসাই হইতেছে দেহের বলরক্ষার উপায় বিধান করা। কি করিলে দেহের বলরক্ষা হয় ও উহার পুষ্টিবিধান হয়, তাহাই দেখা যাউক।

এস্থানেও নির্ম্মল বায়ু ও রবিকর ইহার প্রধান সহায়। ইহা দেহের নানাবিধ উত্তেজনা দূর করিয়া দেহে ও রক্তে নবীন বল

সঞ্চার করে। স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনে দেহের স্বতঃই উন্নতি হয়। এই সব স্থান খট্‌খটে ও নাতিশীতোষ্ণ হইলে ভাল হয় এবং সত্বরে হৃত স্বাস্থ্য পুনরানয়ন করে।

বিশ্রাম এই ব্যাধির অবস্থাবিশেষে একটী বিশিষ্ট ঔষধ। জ্বরযুক্ত দেহকে সুস্থ অবস্থায় আনিতে বিশ্রামের তুল্য আর কিছুই নাই। সুনিদ্রা প্রয়োজনীয়। আহার্য্য যাহাতে সত্বরে জীর্ণ হয়, পুষ্টিকর খাদ্য যাহাতে অল্পায়াসে হজম হয়, যাহাতে পেটের অসুখ না হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, নিয়মিত সময়ে পথ্যাদি পড়ে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে যাহাতে স্বস্তি পাওয়া যায়, তাহাই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। এই সব যাবতীয় বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান প্রয়োজনীয়। খাদ্য এবং অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

(জ) নানাবিধ ঔষধ দ্বারা দেহের বল রক্ষা--ঔষধ দ্বারা দেহের বল রক্ষা কতদূর হয়, তাহা বলা কঠিন। তবে সময় সময় ইহা যে বলরক্ষার সহায়তা করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কড্‌লিভার অয়েল (Codliver oil), মল্ট (Malt), স্যানাটোজেন (Sanatogen) প্রভৃতি পুষ্টিকর ঔষধ এই ব্যাধিতে দেহকে পুষ্ট করে দেখা গিয়াছে। এমন কি, লোকের এমনই ধারণা জন্মিয়াছে যে, শুধু কড্‌লিভার অয়েল সেবনেই এই ব্যাধি বিদূরিত হইতে পারে। কড্‌লিভার অয়েল কি উপায়ে যে দেহের উপকার সাধন করে, তাহার সবিশেষ প্রক্রিয়া আজও জানিতে পারা যায়

নাই। কড্‌লিভার অয়েল এ ব্যাধিতে যদিও উপকার দর্শায়, তথাপি উহা সর্ব্ব অবস্থার জন্য প্রযুজ্য নহে। পেটের অসুখ থাকিলে ইহা প্রায়ই সহ্য হয় না। এইরূপ আরও অনেক অবস্থা আছে, যখন ইহার প্রয়োগ সঙ্গত নহে। সময় সময় কড্‌লিভার অয়েল দেহে মালিশ করিতে দেওয়া হয়। উহা চর্ম্মপথে প্রবেশ করিয়া দেহের পুষ্টিবিধান করে।

বলকারক ঔষধের মধ্যে আর্সেনিক (Arsenic), নাক্স-ভমিকা (Nux vomica), গ্লিসারো-ফস্ফেট (Glycero-phosphates), হাইপো-ফস্ফেট (Hypho-phosphates), প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এ সকলই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইলে তদনুযায়ী ঔষধাদির ব্যবস্থা আবশ্যক। আজকাল অনেক বলকারক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধের (Patent medicines) স্বরূপে এই ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে ফেলোস্ সিরাপ (Fellow's syrup), হাক্সলির সিরাপ (Huxley's syrup), ইলিক্সির ডিজেষ্টিভ গ্লিসারো-ফস্ফেট (Elixir Digestive Glycero-phosphate), ম্যানোলা (Manola), মুস্কান (Mushkan), পেপ্টোফার (Peptofer), আরসেনো ফেরাটোস্ (Arseno Ferratose), গোয়েকোস্ (Guaicose), বাইনো হাইপো-ফস্ফাইট (Byno Hypo-Phosph.), বাইনো-গ্লিসারোফস্ফেট, (Byno-glycero-phosphate), বাইনিন ইমাল্‌শন (Bynin Emulsion), বাইনো-লেসিথিন (Byno-lecithin), বাইনল (Bynol), ফস্ফো লেসিথিন

(Phospho Lecithin), স্কটস্ ইমালশন(Scott's Emulsion), ডি-জন্'স কড্লিভার অয়েল (De Johgne's Codliver oil), কেপ্লারস্ মল্ট একস্ট্রাক্ট (Kepler's Malt Extract), এইঙ্গারস্ পেট্রোলিয়াম ইমালশন (Ainger's Petroleum Emulsion), প্যানোপেপ্টোন (Panopeptone), ইমালশন অফ্ কড্লিভার অয়েল (Emulsion of Codliver oil), ক্রিয়োজোটেড্ ইমালশন অফ্ কড্লিভার অয়েল (Creosoted Emulsion of Codliver oil), ওয়াটারবেরির কম্পাউণ্ড (Waterbury's Compound), ভাইব্রোনা (Vibrona), প্যালল (Palol) প্রভৃতিই অধিক সময় ব্যবহৃত হয়।

যক্ষ্মার আজ পর্য্যন্তও কোন অব্যর্থ নির্দ্দিষ্ট ঔষধ নাই। প্রত্যেক রোগীরই স্ব স্ব অবস্থানুযায়ী চিকিৎসার তারতম্য করিতে হয়। যে পথে এবং যে ভাবেই চিকিৎসা চালান যাক—ব্যক্তিগত-ভাবে তাহার সুবিধা-অসুবিধা অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় স্মরণ করিয়া ব্যবস্থা করিলে, তবেই সফলকাম হইবার আশা করা যায়। এ কথা স্যানাটোরিয়াম সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, ডিস্পেন্সারী ও গৃহচিকিৎসা সম্বন্ধেও সমভাবেই খাটে।

এই চিকিৎসার মূলসূত্র ধরিতে গেলে মুক্ত আলো ও বায়ুতে জীবন যাপন করা—রোগীর রুচি অনুযায়ী পরিমাণ মত পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া ও অবস্থানুযায়ী উপসর্গাদির উপশমের ব্যবস্থা ও চিকিৎসার প্রয়োজন।

অধিকন্তু, রোগিবিশেষে টিউবার্কিউলিন ইন্জেকশন, কাহাকেও

বা শুঁকিবার ঔষধ, কাহারও উপর বা অস্ত্রোপচার, কাহাকেও বা ভ্যাক্‌সিন্ (Vaccine) ইন্‌জেক্‌শন করিতে হয়।

যাহাই কিছু করা যাক, সমস্তই একজন অভিজ্ঞ, চতুর, কর্ম্মকুশল চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে করিতে হইবে। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই রোগীর মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত থাকিবে। তবেই চিকিৎসায় উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

টিউবারকিউলিন (Tuberculin)

টিউবারকিউলিন জিনিসটা লইয়া এত নাড়াচাড়া ও বাগ-বিতণ্ডা হইয়াছে, অথচ যক্ষ্মা চিকিৎসায় এ জিনিসটা এতই অস্পষ্ট অবস্থায় আছে যে, এ সম্বন্ধে দু'চারটি কথা স্বতন্ত্রভাবে বলিলে বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

টিউবারকিউলিন কাহাকে বলে

টিউবারকিউলিন জিনিসটা কি, প্রথমে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সকল অবস্থায় ইহা একই ভাবে প্রস্তুত নহে। বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত হইলেও এবং বিভিন্ন প্রয়োজন-বশতঃ ব্যবহৃত হইলেও, ইহাদের ঐক্যের প্রধান কারণ এই যে, এ সমস্তই টিউবার্কল-জীবাণু বা টিউবার্কল-জীবাণু যে সব উপাদানের (Culture media) ভিতর বৃদ্ধি হয়—তাহা হইতে প্রস্তুত। নানা শ্রেণীর (different strains) জীবাণু হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়াই ইহারা বিভিন্ন এবং ইহা হইতে নির্গত

বিষও (toxin) বিভিন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যক্ষ্মা-জীবাণু প্রধানতঃ মনুষ্যজাতীয় ও গোজাতীয়। ইহাদের প্রত্যেকেও আবার সব সময়ে একই প্রকারের বিষযুক্ত (Virulence) থাকে না। কাজেই নানা প্রকার বিষাক্ত জীবাণু (of various strains) হইতে নানা শ্রেণীর টিউবারকিউলিন প্রস্তুত হয়।

টিউবারকিউলিন দুইটী প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ঃ—

টিউবারকিউলিনের প্রয়োজনীয়তা

১। ব্যাধি আরোগ্য করিবার জন্য।

২। রোগী যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে কি না, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য।

সাধারণতঃ দুইটী উপায়ে ইহা যক্ষ্মা-ব্যাধিগ্রস্তকে আরোগ্য করিয়া থাকে।

টিউবারকিউলিন কিরূপে ব্যাধি আরোগ্য করে

১। যক্ষ্মা-জীবাণু ও তন্নির্গত বিষ দেহের যে অনিষ্ট সাধন করে, সেই অনিস্ট নিবারণে দেহের স্বাভাবিক যে শক্তি আছে, ইহা সেই শক্তিকে বর্দ্ধিত করে এবং ঐ ভাবে জীবাণু ও উহার বিষের ধ্বংস সাধন করে।

২। দেহের যে সকল অংশ যক্ষ্মা-জীবাণুতে ধ্বংস করে, সেই সব অংশকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে সহায়তা করে।

যক্ষ্মা নির্ণয়ে

যক্ষ্মা ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে টিউবারকিউলিনের সাহায্যে উহা নির্ণয় করা যায়। সাধারণতঃ চারিটী উপায় দ্বারাই পরীক্ষা হইয়া থাকে :

(১) **ত্বকের নীচে সূচযোগে টিউ-বারকিউলিন প্রবেশ করাইয়া** (**The Subcutaneous reaction**)। ইহা অতি অল্প মাত্রায় প্রবেশ করাইতে হয়। সুস্থ দেহে সচরাচর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, হইলেও অতি যৎসামান্য হয়; কিন্তু যদি যক্ষ্মা-ব্যাধি থাকে, তবে শরীরের তাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং যে স্থানে সূচ বিদ্ধ করা যায়, তাহার চারি দিক্ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে।

(২) টিউবারকিউলিন জলে দ্রব করিয়া যদি উহার এক ফোঁটা বাহুর উপর রাখিয়া ঐ স্থানে টীকা দেওয়ার মত সামান্য একটু আঁচড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ ঘণ্টার মধ্যেই ঐ স্থানের চতুষ্পার্শ্ব লাল হইয়া উঠে ও ঐ স্থানটি একটু স্ফীত হয়। (Cutaneous reaction of Von Pirquet)।

(৩) টিউবারকিউলিনের মলম যদি বাহুতে বা প্রকোষ্ঠে মালিশ করা যায়, তবে ঐ স্থানের প্রদাহ হইয়া চর্ম্মরোগ (dermatitis) সৃজন করে (Moro's Salve reaction)।

(৪) টিউবারকিউলিন জলে দ্রব করিয়া যদি উহার এক ফোঁটা চক্ষে দেওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ ঘণ্টার মধ্যে চক্ষু লাল হইয়া উঠে ও ভিতরকার কোঠার দিকে যে একটা গোটার (Caruncle) মতন আছে, উহা ফুলিয়া যায় (Oculo reaction of Calmette)।

উপরিউক্ত কয়েকটী পরীক্ষায় সুস্থ দেহের উপর বিশেষ কাজ করে না, মাত্র ব্যাধিগ্রস্তের দেহেই প্রতিক্রিয়া হয় এবং ঐ

উপায়ে উহারা ক্ষয় দ্বারা আক্রান্ত কি না, তাহা জানা যাইতে পারে। ইহার সবগুলিই সমান গুণযুক্ত নহে এবং সকল সময়ে উহাদিগকে বিশ্বাস করাও চলে না। গোজাতির ব্যাধি নির্ণয়েই এই সব পরীক্ষা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

টিউবারকিউলিন কি উপায়ে তৈয়ারী হয়, তাহা বিস্তারিত বলিয়া লাভ নাই। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মৃত যক্ষ্মা-

প্রস্তুত-প্রণালী

জীবাণু ও তাহার বিষ শোধিত (Sterilised) হইবার পর ব্যবহৃত হয়। অবস্থাবিশেষে উহা অন্যরূপ প্রণালীতেও প্রস্তুত হয়। নানা শ্রেণীর জীবাণু হইতে প্রস্তুত হইয়া বিবিধ টিউবারকিউলিন ব্যাধি নিরাকরণে ব্যবহৃত হয়। মনুষ্যজাতীয় ও গো-জাতীয় উভয় জীবাণুই চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কোন্ অবস্থায় কোন্ টিউবারকিউলিন ব্যবহৃত হইবে, তাহা চিকিৎসকগণ বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন।

প্রয়োগ স্থান

সচরাচর উহা ত্বকের নীচে সূচ ফুটাইয়া দেওয়া যায় (Subcutaneous injection)।

এই টিউবারকিউলিন চিকিৎসা সকলেই করিতে পারে না। মাত্রার সামান্য ইতর-বিশেষ হইলে যেখানে সমূহ বিপদের

বিপদের আশঙ্কা

আশঙ্কা, সেখানে অতি বিচক্ষণ ও এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও এই চিকিৎসায় হাত দেওয়া উচিত নয়। অতি সূক্ষ্ম

মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এক গ্র্যামের (Gram) $\frac{১}{১০০০০০০}$ হইতে $\frac{১}{১০০০০০}$ মাত্রায় অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয়। মাত্রার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। অবস্থাবিশেষে প্রত্যেক রোগীর জন্য ভিন্ন মাত্রার দরকার হয়। ব্যাধির অবস্থা, রোগ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, জ্বর আছে কি না, দেহে কিরূপ বল আছে, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিবেচনা করিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। এই ঔষধ ক্রমিক বর্দ্ধিত মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ঔষধ দ্বিতীয় বার ইন্‌জেক্‌শন করিবার সময়ও মাত্রা সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার দরকার। এই ইন্‌জেক্‌শন করিলে শরীরে যে সকল প্রতিক্রিয়া (Reaction) হয়, তাহা দ্বারাও ঔষধের মাত্রা নির্ণয়ে সাহায্য হয়। ইন্‌জেক্‌শনের পরেও সমস্ত অবস্থার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল কারণে যে-সে চিকিৎসকের দ্বারা এই চিকিৎসা করান উচিত নয়। অবশ্য সকল ডাক্তারই ইচ্ছা করিলে এই চিকিৎসায় অভিজ্ঞ হইতে পারেন। তবে এই বিষয়ে কিছুদিন শিক্ষানবিশী দরকার। যে সব হাঁসপাতালে এই সব চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তথায়, কিংবা যে সব বিশিষ্ট চিকিৎসক এই সকল কার্য্যে পারদর্শী, তাঁহাদের নিকট কিছুদিন শিক্ষা লাভ করিয়া, তবেই এই কার্য্যে হাত দেওয়া উচিত। ঔষধের মাত্রা নির্ব্বাচন, কত দিন পর পর ইন্‌জেক্‌শন করিতে হইবে, কত দিন চিকিৎসা করাইতে হইবে, অভিজ্ঞতা ব্যতীত তাহা শিক্ষা করা যায় না। এই কার্য্য যে যত বেশী করিয়াছে, তাহার তত বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, অতি উগ্র বিষ লইয়া কারবার করা

যাইতেছে। সামান্য অমনোযোগিতায় এক জনের প্রাণ যাইতে পারে। সুতরাং বিশেষ মনোযোগ ও সহিষ্ণুতার সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

রোগী বাছাই সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ যে সব যক্ষ্মা-রোগীর জ্বর হয় না বা সামান্য মাত্র জ্বর হয়, টিউবারকিউলিন চিকিৎসায় তাহাদেরই উপকার দর্শে। সুতরাং রোগের প্রথম অবস্থায় এই চিকিৎসা করা উচিত। অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে, যে সব রোগীর জ্বর বেশী থাকে, তাহাদিগকে ইন্‌জেকৃশন দেওয়া কখনই উচিত নহে। ইহা সর্ব্বগ্রাহ্য নহে। এই জ্বর ও ক্ষয়ের অবস্থাতেও যে বিশেষ উহাদের হাতে এই চিকিৎসায় উপকার না হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা নহে; এই সব অবস্থায় নানা দিকে এত বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয় যে, বিশেষ অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক ভিন্ন অপর কাহারও এ কার্য্যের ভার লওয়া উচিত নয়।

কাহাদের উপকার হয়?

যক্ষ্মা-ব্যাধিতে দুইটী অবস্থার বিষয় মনে রাখা উচিত—(১) যক্ষ্মা, (২) ক্ষয়।

(১) যক্ষ্মা বলিতে আমরা যক্ষ্মা-জীবাণুজনিত ব্যাধিমাত্রই বলিয়া থাকি।

(২) ক্ষয়ের অবস্থা ইহা হইতে কিছু পৃথক্। যক্ষ্মা-ব্যাধির শেষ অবস্থায় দেহ যখন জীর্ণ হইয়া পড়ে, ফুস্‌ফুসে গর্ত্ত (cavity) দেখা যায়, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি দেহের

সমস্ত যন্ত্রাদি শিথিল, অবসাদগ্রস্ত, শুষ্ক ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—দেহ কঙ্কালসার হইয়া পড়ে; দেহের এই অবস্থাকে ক্ষয় বলা যায়। এই ক্ষয় অন্যান্য ব্যধিতেও আনিতে পারে। ব্যাধিজনিত যে-কোন কারণেই দেহের যখন একান্ত ক্ষয়প্রাপ্তি হয়, তখনই সেই রোগীকে ক্ষয়গ্রস্ত বলা যায়। যক্ষ্মা-ব্যাধিতে যখন এই অবস্থা আইসে, তখন কি ঔষধে, কি টিউবারকিউলিনে, কি মুক্ত বায়ুতে, কিছুতেই কিছু করিতে পারে না। উপসর্গের কতক উপশম করা যায় সত্য, কিন্তু দেহের ক্রমিক অধোগতি কিছুতেই নিবারণ করা যায় না।

এই টিউবারকিউলিন চিকিৎসায় কোন্ রোগীর কত দিন সময় লাগিবে, তাহা কেহই পূর্ব্বে সঠিক বলিতে পারে না। প্রত্যেকের পক্ষেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। কাহারও হয় ত মাত্র ৩।৪টা ইন্‌জেক্‌শনের বেশী দরকার হয় না। কাহারও ২।৩ সপ্তাহ, কাহারও বা ২।৩ মাস, কাহারও বা ২।১ বৎসরও সময় লাগিতে পারে। তবে সাধারণতঃ ৬ মাস কালের জন্য সকলেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। সকল সময়ে চিকিৎসকও এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলিতে পারেন না। কাহার কোন্ মাত্রায় কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে, সেই মাত্রা কখন বাড়াইবার দরকার, দ্বিতীয় ইন্‌জেক্‌শনে আবার কি প্রতিক্রিয়া হয়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়। ইন্‌জেক্‌শনে কি উপকার হইল, তাহার উপর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কত

কত দিন চিকিৎসা প্রয়োজন

দিনে যে উপকার হইবে, কে জানে ? চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে দীর্ঘ সময়ের জন্যই প্রস্তুত হইতে হইবে। চিকিৎসক যত দিন প্রয়োজন বুঝিবেন, তত দিন ইন্‌জেকৃশন লইতে হইবে। হয় ত কিছুদিনের জন্য ইন্‌জেকৃশন বন্ধ করিয়া কতক দিন পরেই পুনরায় ইন্‌জেকৃশন চলিবে। সুতরাং রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের পক্ষেই ধৈর্য্যের অত্যন্ত প্রয়োজন। এই চিকিৎসা ডাক্তারের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া চলে না। বিশেষজ্ঞের চক্ষুর সম্মুখে থাকা চাই, যেন দেহের সামান্য পরিবর্ত্তনও তাঁহার নজর এড়াইতে না পারে। টিউবে (Ampule) করিয়া টিউবারকিউলিন লইয়া—যে কোন ডাক্তারের দ্বারা ইন্‌জেকৃশন দেওয়া অত্যন্ত মূর্খতা ও অবিবেচকের কাজ। উহাতে রোগীর বিপদের আশঙ্কা আছে ; সুতরাং বিশেষজ্ঞদেরও এমত উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং পুনরায় বলি যে, অতি তীব্র তীক্ষ্ণবীর্য্য বিষ লইয়া কারবার—ইহার মাত্রার সামান্য ইতর-বিশেষে মারাত্মক ফল ফলিতে পারে। সুতরাং ডাক্তার যেখানে নিজে রোগীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন না, সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন না, এবং রোগীও দীর্ঘ সময়ের জন্য চিকিসৎকের নির্দ্দেশমত চলিতে পারিবে না, সেখানে এই চিকিৎসা আরম্ভ করা কেবল যে অনুচিত, তাহা নহে, একান্ত অনিষ্ট-জনক।

বীচি জাতীয় যক্ষ্মা, (Enlarged glands) যক্ষ্মাজনিত মলদ্বারের নালী (Fistulo-in-Ano), যক্ষ্মাজনিত কাণে পূজ

কি কি অবস্থায় ইহা বিশেষ কার্য্যকরী

পড়া (Otites media), শ্বাসনালীর মুখের যক্ষ্মা (Laryngites) প্রভৃতি অবস্থায় ইহার ইন্‌জেকশন বিশেষ কার্য্যকরী। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে এই ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় :—

১। যে সব রোগীকে টিউবারকিউলিন দেওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে আরোগ্যের হার অধিক।

২। যখন রোগীর কোন প্রকার চিকিৎসাতেই উন্নতি দেখা যায় না, তখনও ইহাতে উপকার দর্শে।

৩। এই চিকিৎসায় বেশী উপসর্গ সৃষ্ট হয় না।

৪। যে সব উপসর্গ হয়, সেগুলি এই চিকিৎসায় যত আরোগ্য হয়, অন্য উপায়ে তত হয় না।

৫। রোগী এই চিকিৎসায় দ্রুত আরোগ্য হয়।

৬। একবার সারিলে, পুনরাক্রমণের আশঙ্কা কম।

যক্ষ্মারোগে ইন্‌জেকশন চিকিৎসা

চিকিৎসার বর্ত্তমান যুগকে ইন্‌জেক্‌শন-যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চিকিৎসার্থী মাত্রকেই প্রশ্ন করিতে দেখিতে পাই, "মহাশয়, কয়েকটা ইন্‌জেক্‌শন দিলে হয় না? যদি ইহার কোন ইন্‌জেক্‌শন থাকে, তবে মিছামিছি সময় নষ্ট করিবেন না—কয়েকটি ইন্‌জেক্‌শনের ব্যবস্থা করুন।"

ঐরূপ প্রশ্নে চিকিৎসকদের অনেক সময় বিরক্ত হইতে দেখিতে পাই। তাঁহারা বলেন, "দেখ, যদি ইন্‌জেক্‌শনই প্রয়োজন মনে কর, তবে কোন্ ঔষধটি ভরিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দাও, আর সবই যখন জান, তখন অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ কেন? যাও, নিজের ব্যবস্থা নিজেই কর গিয়ে।"

রাগ প্রকাশের কোন হেতু দেখি না—কারণ, এ অবস্থাটি চিকিৎসকেরাই আনিয়াছেন। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে সর্ব্ব অবস্থাতেই ইন্‌জেক্‌শন চলিতেছে।

ইন্‌জেক্‌শন-চিকিৎসা অত্যন্ত আশু ফলপ্রদ। সুতরাং উপকার হইলে সত্বরেই হয়। এমত অবস্থায় রোগীরা উহা লইতে স্বতঃই ইচ্ছা করিবে।

ইন্‌জেক্‌শনের ছড়াছড়ি দেখিয়া সর্ব্বসাধারণেও উহা লইতে আগ্রহ প্রকাশ করে—আর তাহারা বাস্তবিকই মনে করে যে, ইন্‌জেক্‌শন হইলেই নিশ্চিত ভাল হইবে। কিন্তু ইন্‌জেক্‌শন-

চিকিসারও যে সীমা আছে, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মা-ব্যাধিতে সময় সময় ইন্‌জেক্‌শনে ফল না হয়, তাহা নহে। কিন্তু সর্ব্ব অবস্থায় উপকার হয় না। কত ঔষধই যে ইন্‌জেক্‌শনের জন্য আবিষ্কৃত হইল, আর কতই যে বিস্মৃতির সাগরে বিসর্জ্জিত হইল, তাহার শেষ নাই। সাধারণতঃ যক্ষ্মা-ব্যাধিতে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ইন্‌জেক্‌শনরূপে ব্যবহৃত হয়।

১। টিউবার্কিউলিন (Tuberculin).

২। অ্যালিলিন (Allyline).

৩। নেবিও (Nebios).

৪। সোডিয়াম মরুয়েট (Sodium Morrhuate).

৫। ক্রিসলোগান (Kryslogan).

৬। স্যানোক্রাইসিন (Sanocrysin)

৭। স্পেন্‌গ্লারস্‌ জে কে ইমিউন বডিস (Spengler's Immunue bodies (J K).

৮। স্প্যালিঙ্গার সেরাম (Spahlinger's Serum).

৯। মারমোরেক্‌স্‌ সেরাম (Marmorek s Serum).

১০। ম্যারাগ্লিয়ানো সেরাম (Maraglianos Serum)

১১। ক্যাল্‌মেট্‌স ভ্যাক্‌সিন (Calmettes Vaccine).

১২। কলোসাল্‌ ক্যালসিয়াম্‌ (Collosal Calcium)

১৩। " আইওডিন (" Iodine)

১৪। " এন্টিমণি (" Antimony)

১৫। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড্‌ (Calcium Chloride)

১৬। ডিউয়ারের আইডোফরম ইন্‌জেকশন (Dewar's Iodoform injection)

১৭। আইওডিওল (Iodeol)

১৮। আইওড আসেপ্‌টিন্ (Iodaseptine)

১৯। হাইপার কাইটল্ (Hypercytol)

চিকিৎসক ভিন্ন এ সকলের প্রয়োগ চলে না। বিস্তৃত চিকিৎসা সম্বন্ধে এই পুস্তকে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং ঐ সব ঔষধের দোষ গুণ সম্বন্ধে এ স্থানে বিচার করিব না—ইন্‌জেকশনের ঔষধ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য ঔষধগুলির উল্লেখ করিলাম। টিউবার্কিউলিনের কথা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি—উহাও নিম্নলিখিত প্রকারের ব্যবহৃত হয়।

১। ককের ওরিজিনাল বা পুরাতন টিউবার্কিউলিন (Koch's original or old Tuberc—OT prep.)

২। ডেনীস্ বুলিয়ন্ ফিলট্রেট (Deny's Bouillon Filtrate—BF prep.)

৩। জশ্‌ম্যানস্ এলবুমোজ ফ্রী টিউবার্কিউলিন (Joch-man's Albumose Free Tub—A F prep.)

৪। ককস্ ব্যাসিলাই ইমাল্‌শন্ (Koch's Bacilli Eumulsion—B E prep.)

৫। ককস্ নিউ টিউবার্কিউলিন (Koch's Tuberculin—Residue or New Tuberculin—TR prep.)

৬। বেরানেক্‌স্‌ টিউবার্কিউলিন (Beraneck's Tuberculin prep.)

৭। ভন্‌ রাকস্‌ ওয়াটারী একষ্ট্রাক্ট (Von Ruck's Watery Ext. prep.)

৮। ল্যাণ্ডম্যান্‌স টিউবার্কিউলিন (Landman's Tuberculol prep.)

এ সকল কেবল বিশেষজ্ঞেরা প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিতে পারেন। সাধারণ চিকিৎসকেরা অ্যালিলিন, সোডিয়াম মরুয়েট, কলোসাল ক্যালসিয়াম, কঃ আইডিন প্রভৃতি সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে পারেন। অন্যগুলি সাধারণ চিকিৎসকের জন্য নহে। উহাদের একটু ইতর-বিশেষে গুরুতর অনিষ্ট হইতে পারে। ইহাদের কোনটিতেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই, তবে অবস্থাবিশেষে বিশেষজ্ঞদের হাতে সময় সময় বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ চিকিৎসক দ্বারা এ সব ইন্‌জেক্‌শন-চিকিৎসা কখনও করাইবে না।

সৌর স্নান ও অন্যান্য কৃত্রিম আলোক-চিকিৎসা

সূর্য্যালোক (Helio-therapy), ফিন্‌সেন আলো (Finsen's ray), ভায়লেট আলো (Violet rays) এবং আল্‌ট্রা-ভায়লেট আলো (Ultra-Violet rays) প্রভৃতি কৃত্রিম আলোর সাহায্যে চিকিৎসা।—এ সকল শুনিতে যত সহজ, কার্য্যে তত নহে—বিরাট্ মহাভারতবিশেষ। সৌর-স্নানের জন্য যে সব চিকিৎসাগার আছে, সে সব বিরাট্ কারবার। কৃত্রিম আলো সরবরাহ হয়—কোয়ার্টজ-মারকিউরী ভেপার ল্যাম্প (Quartz Mercury Vapour Lamp), অ্যালপাইন সান্ ল্যাম্প(Alpine Sun-Quartz Lamp), কার্ব্বন আর্ক ল্যাম্প (Carbon Ark Lamp) প্রভৃতি দ্বারা। ইহাদের দ্বারা যদিও অনেক স্থলে উপকার হয়, তথাপি উহা সৌর-স্নানের মত কার্য্যকরী নহে। সৌর-স্নান দ্বারা যক্ষ্মা-কাশিতে বেশী উপকার হয় না। তবে যক্ষ্মাজনিত চর্ম্মরোগে, হাড়ের যক্ষ্মায় ও গ্রন্থির আক্রমণে ইহার প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। এ সব উপকার দুই এক দিনে হয় না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের নির্দ্দেশমত বহু দিন চিকিৎসাধীন থাকিতে হয়। বিশ্রামে থাকিতে হয়, প্রথম দিক্‌টায়। আক্রমণ অনুসারে শরীরের অল্প অংশ প্রথমে সৌরালোকে স্থাপিত করিতে হয়। উহাও প্রথমে অতি অল্প সময়ের জন্য, ক্রমে বেশী সময় রাখিতে হয়। সর্ব্বদাই

ডাক্তার রলিয়ারের সৌর-চিকিৎসালয়ের একটি দৃশ্য

চিকিৎসকের উপদেশমত কার্য্য করিতে হয়। হয়ত ৬ মাস হইতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত চিকিৎসাধীনে থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে যে সব প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডে ডাক্তার রলিয়ারের (Rollier) প্রতিষ্ঠানই বিশেষ খ্যাতি-সম্পন্ন। ভবিষ্যতে হয় ত প্রত্যেক বড় হাঁসপাতালেই সৌর-স্নানের চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইবে। এ সমস্তই বিশেষজ্ঞের কাজ।

কৃত্রিম উপায়ে নিউমো-থোরাক্স (Pneumo-thorax) দ্বারা যক্ষ্মা-কাশির চিকিৎসা

এ সব চিকিৎসা অতিশয় কঠিন ও রোগী বিশেষ বাছাই করিয়া করিতে হয়। যক্ষ্মা-রোগীর প্লুরিসি বা নিউমো-থোরাক্স হইলে সেই দিক্‌কার ব্যাধি কমিতে বা আরোগ্য হইতে দেখা যাইত। এমন কি, যে দিক্‌টায় আক্রমণ হয়, রোগী যদি সর্ব্বদা সেই পাশে শুইয়া থাকে, তবে ব্যাধির প্রকোপ কমে। যে দিক্‌টায় ব্যারাম, সে দিক্‌টা বাঁধিয়া নিশ্চল করিতে পারিলেও উপকার দর্শে। এই উপলক্ষে সিউয়াল (Sewall) এক দিকের গতি নিরোধের জন্য এক প্রকার বন্ধনী (Belt) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নফ্‌ (Knopf) বলেন যে, শ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াও ফুস্‌ফুস্‌কে ঐরূপ বিশ্রাম দেওয়া যায়। এই সব হইতে ক্রমে কৃত্রিম উপায়ে নিউমো-থোরাক্স করিয়া যক্ষ্মা-কাশির চিকিৎসার পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং উহাতে সফলতাও পাওয়া গিয়াছে। মোটামুটি কথা এই যে, বক্ষোগহ্বরে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু বা কোন গ্যাস প্রবেশ করাইয়া ফুস্‌ফুসের পতন (Collapse) সৃষ্টি করিয়া উহাকে বিশ্রাম দানে চিকিৎসা। স্বাভাবিক অবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌ সর্ব্বদা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হওয়ায়, যক্ষ্মা-বীজাণু নানা স্থানে নীত হইবার সুযোগ হয় এবং তাহাতে ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে। ঐ গতি

বারণ হইয়া ফুস্‌ফুস্‌ নিশ্চল অবস্থায় থাকিলে যক্ষ্মা-জীবাণু কোণ-ঠেসা হইয়া আরোগ্যের উপায় বিধান করে।

এই সব কাজ বিশেষজ্ঞের। হয় ত বহু দিন ফুস্‌ফুস্‌কে পতন অবস্থায় রাখিতে হইবে। এই সব বায়ু বা গ্যাস ঢুকাইবার সময় বহু বিপদের আশঙ্কা আছে। সাধারণের অবগতির জন্য ইহার উল্লেখ করিলাম মাত্র। এই বিষয়ে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ ভিন্ন এ চিকিৎসা করাইতে যাওয়া আর মরণ ডাকিয়া আনা একই কথা।

স্যানাটোরিয়াম

স্যানাটোরিয়ম-চিকিৎসা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের দেশে এই সব স্যানাটোরিযাম কোথায় কোথায় আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিলাম। দেশে ক্রমশঃ ব্যাধির যেরূপ বিস্তার হইতেছে, সে অনুপাতে স্যানাটোরিয়ামের সংখ্যা অতিশয় কম। সমস্ত ভারতবর্ষে ১০।১২টি স্যানাটোরিয়াম থাকিলেও প্রকৃত হিসাবে রীতিমত স্যানাটোরিয়াম ৩।৪টির বেশী নাই। ১৯২১ সনে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স-এ (England and Wales) এই ব্যাধির আক্রমণ দূর করিবার জন্য ৩৪১ জন কর্ম্মচারী ৪১২টী ডিস্পেন্সারী, স্যানাটোরিয়াম এবং হাঁসপাতালে ১৮০০০ রোগী থাকিবার ব্যবস্থা ও আরও ৩৫০০ রোগীর যাহাতে স্থান হইতে পারে, তাহার আয়োজন হইতেছিল। ইংলণ্ডের লোক-সংখ্যার অনুপাতে উহা বহুসংখ্যক হইলেও তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ তাহাও যথেষ্ট মনে করেন নাই। আর আমাদের এই ভারতবর্ষের ৩২ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১০।১২টি স্যানাটোরিয়াম ! আর তাহাতে মাত্র কয়েক শতের স্থানও সঙ্কুলান হয় না। ইহা কি একান্ত লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় নহে ? এই পীড়ায় প্রতি বৎসর যে এত লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার প্রতিকারের জন্য আমরা কি করিতেছি ? কিছুই না,

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই শ্যামল, বিস্তীর্ণ, ধনধান্যপূর্ণ বৃহৎ বাঙ্গালাদেশে একটী মাত্র স্যানাটোরিয়ামও নাই, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। বঙ্গদেশ কি চিরদিনই সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে? কাহারও যদি স্যানাটোরিয়ামে থাকিবার আবশ্যক হয়, অমনি বাঙ্গলার বাহিরে সুদূর প্রবাসে যাইতে হইবে। আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিবার উপায় নাই—বন্ধুজনের সাক্ষাৎ নাই—আপনার যে ভাষা, তাহা শুনিয়াও কাণ জুড়াইবার পথ নাই? এ কি কম কষ্ট! রোগ কি এমনই করিয়া নিবারণ হয়? দেশে ত ধনকুবেরের অভাব নাই! ইচ্ছা করিলে অনেকেই এ সম্বন্ধে একটা উপায় করিতে পারেন এবং দেশেরও লজ্জা নিবারণ হইতে পারে—ততোধিক, রোগকাতর বেদনাক্লিষ্ট জনসমূহের দুঃখ দূর হইতে পারে—একটা স্বাচ্ছন্দ্য, একটা শান্তি, নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হওয়ার একটা উল্লাস জন্মিতে পারে। ইহাদের জন্য ভাবিবার, ইহাদের জন্য এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিবার মত লোক, এই সাত কোটীর ভিতর কি একটীও নাই?

যতদূর অবগত আছি, বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত স্যানাটোরিয়াম আছে,—

বোম্বাই প্রদেশে

১। ভাওয়াদা হিল্ স্যানাটোরিয়াম (Bhoiwada Hill Sanatorium)

২। হিন্দুদের জন্য স্যানাটোরিয়াম, কার্লা (Sanatorium for Hindus, Karla)

৩। দেওলালী বাহাদুরজী স্যানাটোরিয়াম (Bahadurji Sanatorium, Deolali)

৪। পঞ্চগণী স্যানাটোরিয়াম (Bel-air Sanatorium, Panchgani)

৫। পারেল স্যানাটোরিয়াম (Parel Sanatorium)

মাদ্রাজ প্রদেশ

১ মদনপল্লী ইউনিয়ন মিশন স্যানাটোরিয়াম Union Mission Santorium, Madanpalli)

পাঞ্জাব প্রদেশ

১। ধরমপুর কিং এড্ওয়ার্ড স্যানাটোরিয়াম (King Edward Sanatorium, Dharampur)

২। পাতিয়ালা দরবার স্যানাটোরিয়াম, ধরমপুর (Patiala Durbar Sanatorium, Dharampur)

যুক্ত-প্রদেশ

১। কিং এড্ওয়ার্ড স্যানাটোরিয়াম, ভাওয়ালী (King Edward VII Sanatorium, Bhowali)

২। জেনানা মিশন স্যানাটোরিয়াম, আলমোরা (Mission Sanatorium for Females, Almora)

মধ্য-প্রদেশ

১। মিশন স্যানাটোরিয়াম, পেণ্ড্রা (Mission Sanatorium, Pendra)

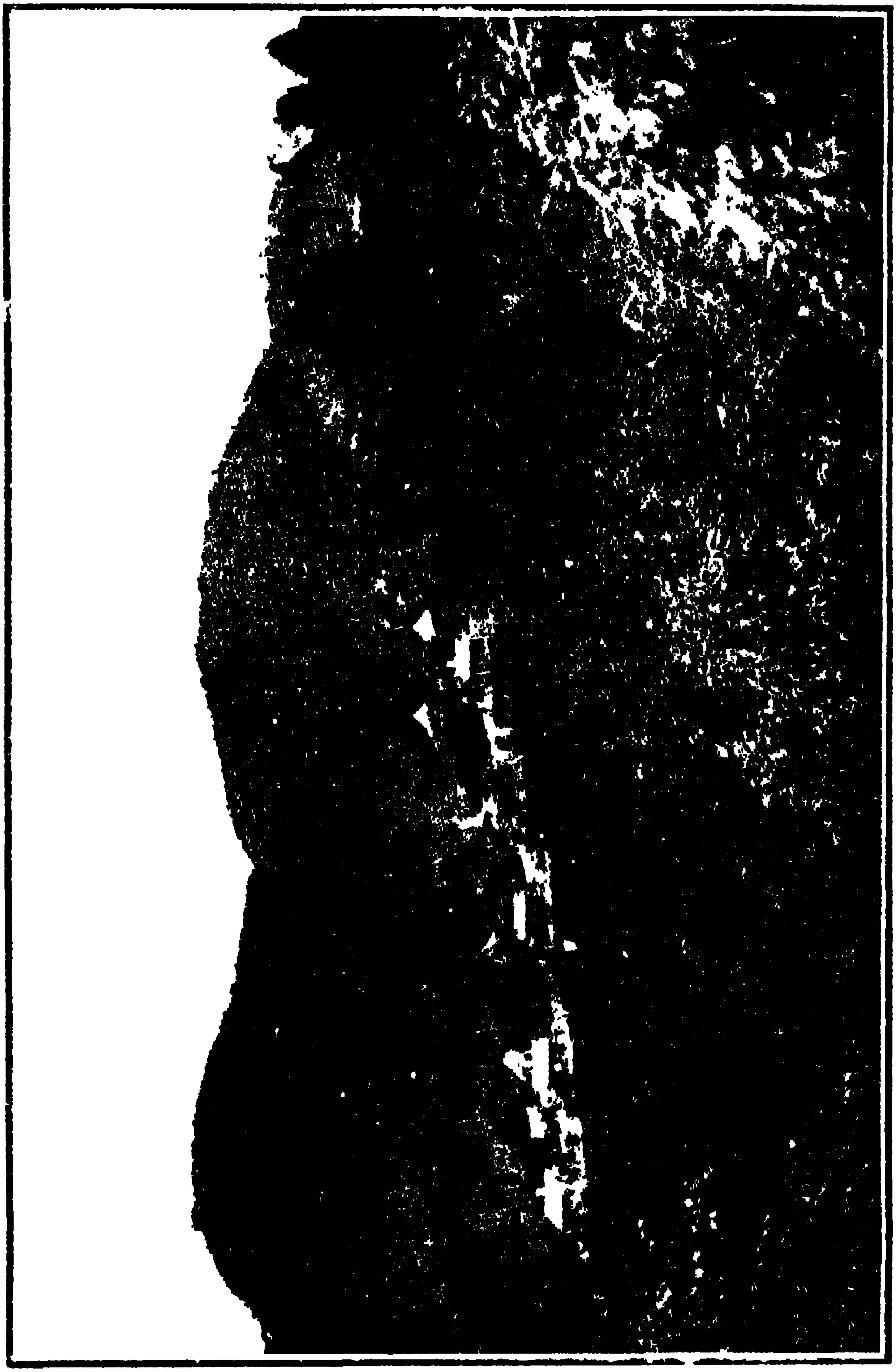

রাজপুতানা

১। মিশন স্যানাটোরিয়াম, আজমীর (Mission Sanatorium, Tilaunia, Ajmere)

মধ্য-ভারতবর্ষ

১। হোলকার দরবার স্যানাটোরিয়াম, রাও (Holkar's Durbar Sanatorium, Rao)

এই সকলের মধ্যে কিং সপ্তম এডওয়ার্ড স্যানাটোরিয়াম ভাওয়ালী, ধরমপুর কিং এডওয়ার্ড স্যানাটোরিয়াম ও মদনপল্লী স্যানাটোরিয়ামই সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়াম —ইহা যুক্ত-প্রদেশের মধ্যে হিমালয়ের অন্তর্গত কুমায়ন পাহাড়ে অবস্থিত। ইহা নৈনিতাল হইতে ৮ মাইল এবং কাঠগোদাম (Kathgodam) হইতে ১৩ মাইল দূরে স্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে ৬৭৫ বিঘা স্থান লইয়া, অতি মনোরম দৃশ্যাবলীর মধ্যে ইহা স্থাপিত। ১৯১২ সনে ইহা সংস্থাপিত হয়। এখানে ৬৩ জন রোগী থাকিতে পারে—১১জন ইউরোপীয় এবং ৫২ জন ভারতবর্ষীয়। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে ২০ জনকে বিনা খরচায় থাকিতে দেওয়া হয়, অন্যান্যের, স্থানের তারতম্য অনুসারে ২০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা করিয়া মাসিক খরচা। ইউরোপীয়দিগকে মাসিক ৫০৲ হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। স্ত্রীলোকদেরও থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। ভাওয়ালী (Bhowali) কিং সপ্তম এডওয়ার্ড স্যানাটোরিয়ামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেই উহার সকল সংবাদ জানা যাইতে পারে।

ধরমপুর স্যানাটোরিয়াম

ধরমপুর কালকা-সিমলা রেল লাইনের উপর স্থিত। ইহা কালকা হইতে রেল-পথে ২০ মাইল এবং টোঙ্গার রাস্তায় ১৬ মাইল দূরে। ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৩০০ বিঘা জমি লইয়া। ধরমপুর রেলষ্টেশন হইতে ১০ মিনিটে হাঁটিয়া স্যানাটোরিয়ামে পৌঁছান যায়। ডাণ্ডি, টোঙ্গা প্রভৃতি নানাজাতীয় যান-বাহনাদি ষ্টেশনে পাওয়া যায়। ডাণ্ডিওয়ালা পৌঁছাইতে ॥০ হইতে ১৲ পর্য্যন্ত নেয়। এই স্যানাটোরিয়াম ১৯০৯ সনে স্থাপিত হয় এবং ইহাতে ৫০ জন লোক থাকিবার ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে ১০ জনকে বিনা খরচায় রাখা হয়। পূর্ব্বে দরখাস্ত করিয়া, স্থান আছে কি না জানিয়া ভর্ত্তি হইতে হয়। ভারতবর্ষীয়দের সাধারণতঃ খাওয়া খরচ বাবদ ৩০৲ টাকা আন্দাজ ও ঘরভাড়া প্রভৃতি অন্যান্য বাবদ আরও ৩০৲ টাকা মোট ৬০৲ টাকা লাগে। অন্যান্যের খাওয়া খরচ বাবদ ৫০৲ লাগে, ঘরভাড়া ঐ ৩০৲ টাকা। বাটী বিশেষের ভাড়া ৫০৲ হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্তও আছে। চাকরদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে—উহাদের জন্য ১০৲-১২৲ বা ১৫৲ টাকা মাসিক দিতে হয়। এখানেও স্ত্রীলোকদের থাকিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে ও বিভিন্ন ভাড়ায় বিভিন্ন রকমের ঘরের বন্দোবস্ত আছে। এখানকার সর্ব্ববিধ সংবাদ ধরমপুর কিং এডওয়ার্ড স্যানাটোরিয়ামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট লিখিলে জানিতে পারা যায়।

ইহা লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির দ্বারা ১৯০৮ সালে

জেনানা মিশন স্যানাটোরিয়াম, আলমোরা

আলমোরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কেবল খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকদের জন্য। ইহাতে ৩০টি স্ত্রীলোকের থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

এখানে গবর্ণমেণ্টেরও সামান্য সাহায্য আছে। বোম্বাই সহরের সন্নিকটে প্যারেলে কিং পঞ্চম-জর্জ্জ এন্টিটিউবার্কিউলার সমিতির অধ্যক্ষতায় পশ্চিম-ভারতীয় টার্ফ ক্লাবের দানের টাকায় স্যানা-

প্যারেল স্যানাটোরিয়াম

টোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাই সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটির অর্থসাহায্যে ইহার পরিচালনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এখানে ৫০জন রোগী থাকিতে পারে।

ইং ১৯১২ সনে মাদ্রাজের চিটুর জেলায় মদনপল্লীতে

মদনপল্লী ইউনিয়ন মিশন স্যানাটোরিয়াম

প্রথমে ইহা সংস্থাপিত হয়, পরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নিকটস্থ এরোগিয়াভেরামে (Arogaivarum) স্থানান্তরিত করা হয়।

যদিও ইহা ইউনিয়ন মিশন স্যানাটোরিয়াম নামে পরিচিত এবং মুখ্যতঃ খ্রীষ্টানদের জন্য নির্ম্মিত, ইহাতে অনেক হিন্দু মুসলমানও স্থান পাইয়া থাকেন। মাদ্রাজ সরকার এখানে এককালীন যথেষ্টভাবে অর্থসাহায্য করিয়াছেন এবং ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি বৎসরও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে অধিক উর্দ্ধে নহে। ইহার চারিদিকে অরণ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম, জলবায়ুও খুব ভাল। এখানেও অনেক লোকের থাকিবার স্থান আছে। বৎসরে প্রায় ২০০।৩০০ লোক এখানে থাকিয়া চিকিৎসিত হয়।

মিশন স্যানাটো-রিয়াম, আজমীর

আজমীরের নিকটে তিলাউনিয়াতে আমেরিকান মেথডিষ্ট এপিস্‌কোপিয়াল মিশনের (American Methodist Episcopal's Mission) স্ত্রীলোকদের জন্য একটি স্যানাটোরিয়াম আছে। এখানে প্রধানতঃ ইঁহাদের অধ্যক্ষতায় যে সব মেয়েদের স্কুল আছে, তথাকার ছাত্রীদের এই ব্যাধি দেখা দিলে তাহাদিগকে রাখা হয়। এই সঙ্গে অন্যান্য মিশনের ছাত্রীদেরও স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি হিন্দু স্ত্রীলোকদের জন্যও একটী দালান তৈয়ারী হইয়াছে।

পেণ্ড্রা মিশন স্যানাটোরিয়াম

মধ্য-প্রদেশে বিলাসপুরের নিকটে পেণ্ড্রাতেও মিশনারীদের খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোক ও বালিকাদের জন্য একটি স্যানাটোরিয়াম খোলা হইয়াছে।

হোলকার দরবার স্যানাটোরিয়াম, রাও

ইন্দোরের নিকটে রাও (Rao) নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে মহারাজা হোলকার কর্তৃক ৩০ জন লোক থাকিতে পারে, এরূপ একটী স্যানাটোরিয়াম খোলা হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন পুনায়, কারলায় (Karla), লোনাভ্‌লায় (Lonavla), পুরীতে ও দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানেও কতক কতক যক্ষ্মারোগীর থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। দার্জ্জিলিং-এ লুই জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে বৈকুণ্ঠনাথ থাইসিকাল ব্লকে (Baikuntanath Pthisical Block) কয়েকটী রোগীর থাকিবার স্থান আছে।

সম্প্রতি কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজেও ছাতের উপর ঘর করিয়া কয়েকটী যক্ষ্মারোগী রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মাদ্রাজ, বিহার, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি নানা স্থানে নূতন যক্ষ্মানিবাস খুলিবার প্রয়াস চলিতেছে। ইহার যত প্রসার হয়, দেশের ততই মঙ্গল।

কিন্তু এই সমুদয় স্থানের হিসাব করিলেও ইহাতে ৫০০ জনের অধিক লোকের স্থান হওয়ার উপায় নাই। ৩২ কোটী লোকের মধ্যে মাত্র ৫০০ স্থান কি একান্ত লজ্জার কথা নহে? কি গবর্ণমেণ্ট, কি দেশস্থ ধনকুবেরগণ, কাহারও কি এ দিকে দৃষ্টি পড়িবে না?

স্যানাটোরিয়ামের উদ্দেশ্য

(১) মুক্ত বায়ুর উপকারিতা এখানে প্রতিদিন হাতে-কলমে অভ্যাস করা।

(২) রোগীর আয়ের উপযোগী ব্যয় শিক্ষার সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করা।

(৩) স্বাস্থ্য পুনরানয়নে প্রকৃতির পথ অনুসরণ করিয়া চলা।

(৪) রোগীর শক্তি অনুযায়ী এবং প্রয়োজন মত আলোক, বায়ু, শ্রম, বিশ্রাম প্রভৃতি সমস্তই একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে আনা।

(৫) প্রয়োজন অনুসারে এবং বিবেচনা মত রোগীর উপকারার্থে যাবতীয় চিকিৎসার বিধান করা।

স্যানাটোরিয়ামের উপকারিতা—

১। সংযম।

২। শিক্ষা।

৩। চতুষ্পার্শ্বস্থ সুন্দর দৃশ্য ও মনোরম স্থান।

৪। সর্ব্বদা খবর লওয়া ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

৫। বহুদর্শী ও বিশেষজ্ঞের উপদেশ।

৬। বিশ্রাম ও নিয়ম পালন।

৭। ভাল এবং উপযুক্ত খাদ্য।

৮। নির্ম্মল বায়ু।

৯। মাত্রানুযায়ী শরীরের শ্রম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যক্ষ্মা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা

ক্ষয় বিস্তারের নানাবিধ কারণ

আমরা ইহার অধিকাংশ বিষয় সম্বন্ধে অন্য স্থানে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে উহাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র :

১। কতকগুলি কু-অভ্যাস,—

(ক) যেখানে সেখানে থুতু নিক্ষেপ করা ;

(খ) বদ্ধ বায়ু সেবন ;

(গ) মাথা ঢাকিয়া নিদ্রার অভ্যাস।

(ঘ) এক পাত্র হইতে পানাহার, ভুক্তাবশেষ ভোজন, এক হুকায় তামাক খাওয়া, এক জনের খাওয়া সিগারেট প্রভৃতি অপরে খাওয়া, চর্ব্বিত পান খাওয়া, ইত্যাদি।

(ঙ) খাদ্য দ্রব্য অনাবৃত রাখায়, ধূলির সহিত বা মক্ষিকাদি দ্বারা যক্ষ্মাজীবাণু সংক্রমণ।

(চ) দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য ভাল করিয়া না ফুটাইয়া আহার করা।

(ছ) শিশুদিগকে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়া খেলিতে দেওয়া,—উহাদের মুখে যাহা তাহা দেওয়া বন্ধ না করা, ছেলেদের পেন্সিল মুখে দেওয়া, থুতু দ্বারা শ্লেট মোছা, ফল ও

রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য এক জনে এক কামড় খাইয়া অপরকে খাইতে দেওয়া, নোট গুণিবার সময় বা বইএর পাতা উল্টাইবার কালে থুতু আঙ্গুলে লাগান।

(জ) অতিরিক্ত মদ্যপান বা ভাঙ্গ, গাঁজা, কোকেন, আফিং প্রভৃতি খাওয়ার অভ্যাস।

(ঝ) অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা।

(ঞ) জামা কাপড় পরিধান করিবার কুপ্রণালী ও অতিরিক্ত ভারী কাপড় ব্যবহার।

(ট) এক রাশি ধূলি উড়াইয়া ঘর দুয়ার রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া।

২। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ,—

(ক) খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা।

(খ) খাদ্য দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য।

(গ) খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল।

(ঘ) দারিদ্র্য।

(ঙ) আলোক-বায়ুশূন্য অন্ধকার বাসগৃহ।

(চ) গৃহে লোকবাহুল্য।

(ছ) বাল্য-বিবাহ।

(জ) স্ত্রীলোকদের পর্দ্দা-প্রথা।

(ঝ) সূতিকা-গৃহের দুরবস্থা।

(ঞ) কতকগুলি ব্যবসা ও কার্য্য, যাহাতে যক্ষ্মা সহজে আক্রমণ করে।

(ট) বড় বড় কল কারখানায় লোকবাহুল্যের দরুন ও থাকিবার অস্বাস্থ্যকর স্থানের দরুন যক্ষ্মার আধিক্য।

(ঠ) রেল ষ্টীমারে গমনাগমনের সুবিধা হওয়ায়, ব্যাধি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংক্রমণের সুযোগ।

(ড) মেলা, যোগস্নান, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতিতে বহু লোকের একত্র সমাবেশ।

(ঢ) মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ও নিম্নশ্রেণীর মজুরের অল্প বেতনের দরুন অর্থকৃচ্ছ্রতা ও অল্পাহার

(ণ) এক মশারীর মধ্যে বহু লোকের বাস;—ইহা কতকটা অর্থাভাবজনিত, কতকটা কু অভ্যাসবশতঃ।

৩। দেশের স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং, অনাথ ও আতুর-আশ্রম প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কু-ব্যবস্থা।

(ক) স্কুল দালান প্রভৃতিতে অনেক স্থানে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকে না।

(খ) প্রতি জনের যে পরিমাণ বায়ুর ব্যবস্থা দরকার, ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ায় তাহা না থাকা।

(গ) খাদ্য দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য ও অপব্যবহার। অধিকাংশ বোর্ডিং, হোস্টেল প্রভৃতির খাদ্য অতি নিকৃষ্ট। যাহাদের উপর খাদ্য সরবরাহের ভার থাকে, তাহারা খাদ্যের মূলসূত্র সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ; কাজেই নানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্যের সামঞ্জস্য একেবারেই থাকে না। কেবল শর্করাজাতীয় খাদ্যেরই বাহুল্য থাকে, প্রোটিড্ জাতীয়ও কিছু থাকে, অধিকাংশ সময়েই চর্ব্বী-

জাতীয় পদার্থের অভাব থাকে। তেলের সামান্ত ছিটা ফোঁটাই হয়ত ইহার প্রকাশ,—প্রায় শতকরা নিরান্নব্বই স্থানে আদৌ ঘি কিংবা দুধের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং যাঁহারা এই সব খাদ্য যোগানের ভার লইবেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং স্কুলে যাহাতে এই সব জ্ঞান প্রচার হয়, তাহারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ দুরবস্থা যে শুধু বোর্ডিংএ ও হোষ্টেলে, তাহা নহে, আমাদের অধিকাংশ গৃহেও! আমাদের খাদ্য সরবরাহের প্রণালীর পরিবর্ত্তন না হইলে জাতি ক্রমশঃই ধ্বংসমুখে যাইবে।

(ঘ) ছেলে মেয়েদের পাঠ্য নির্ব্বাচনে বিবেচনার অভাব। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে পুস্তকের বিপুল বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট করা।

(ঙ) বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা।

(চ) শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশের প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

(ছ) বসিবার বেঞ্চ ও লিখিবার ডেস্ক প্রভৃতি তৈয়ার করিবার কালে বড় ছেলেদের ও ছোটদের জন্য কোন প্রভেদ না রাখা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় মাপ-মত নির্ম্মাণ না করা।

(জ) শারীরিক ব্যায়াম না করা।

(ঝ) ডাক্তার দ্বারা ছাত্রদের নিয়মিত পরীক্ষা না করা। যাহাদের এই সব ব্যাধি আছে, তাহাদের স্বতন্ত্র না রাখায় ব্যাধি সংক্রমণের সুযোগ।

যক্ষ্মা-জীবাণুর জীবনী-শক্তি সম্পর্কে পরীক্ষা

বোম্বাইএর ডাঃ এম বি সোপারকার (Dr. M. B. Soparkar) তাঁহার পরীক্ষাগারে যক্ষ্মা-জীবাণু সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

১। থুতুর অভ্যন্তরস্থ ক্ষয়-জীবাণু সাক্ষাৎ সূর্য্যালোকে (Direct Sunlight) ৬ ঘণ্টা পরিমাণ কাল জীবিত ছিল, কিন্তু ৮ ঘণ্টার পরে মৃত্যু হইয়াছিল।

২। যখন উহাদিগকে সূর্য্যালোকে পরোক্ষভাবে (Diffused Sunlight) রাখা গিয়াছিল, তখন ৬ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, কিন্তু ৮ দিনের পর মৃত্যু ঘটে।

৩। যদি ঐ থুতু—এমন কি, শুষ্কাবস্থায়ও যদি উহা অন্ধকারে রাখা যায়, তবে তদন্তর্গত যক্ষ্মা-জীবাণু ৩০৯ দিন কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং তখনও তাহাদের পীড়া উৎপাদনের ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকে।

৪। যে থুতুতে পচনক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতেও যক্ষ্মা-জীবাণু জীবিতাবস্থায় ২০ দিন পরে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ২৬ দিন পরে আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই।

৫। মনুষ্যজাতীয় যক্ষ্মা-জীবাণু হইতে গোজাতীয় যক্ষ্মা-জীবাণু, উভয় প্রকার সূর্য্যালোকেই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে।

৬। বৈদ্যুতিক আলোকপাতে গোজাতীয় জীবাণু ৭৪ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, কিন্তু ১০০ দিনের পরে মৃত্যু ঘটে।

৭। এক দলা (Pellet) থুতু যদি সাক্ষাৎ সূর্য্যালোকে রাখা যায়, তবে উহা শুকাইয়া ধূলি হইতে ৩৷৪ ঘণ্টা লাগে। আর যদি পরোক্ষ সূর্য্যালোকে রাখা যায়, তবে ঐ অবস্থায় আসিতে ৩৷৪ দিন লাগে।

৮। কোন পালিশ করা জিনিষের উপরে থুতু শুকাইতে যে সময় লাগে, তার চেয়ে ধূলিযুক্ত স্থানে কম সময় লাগে।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, থুতু শুকাইবার পরেও কতকটা সময় পর্য্যন্ত যক্ষ্মা-জীবাণু জীবিত থাকে। অপ্রতিহত সূর্য্যালোকে (Direct Sunlight) এই সময় মোটামুটি ২ ঘণ্টা ধরা যাইতে পারে। এই সময় খুব দীর্ঘ নহে। সুতরাং খোলা স্থানে যে সব থুতু নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইতে পীড়া সংক্রমণের আশঙ্কা খুব বেশী নহে।

পরোক্ষ সূর্য্যালোকে থুতু ফেলিলে, উহার ভিতরস্থিত যক্ষ্মা-জীবাণু কয়েক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, সূর্য্যালোকের কম বেশী অনুসারে সময়ের তারতম্য হয়, তবে এ অবস্থায়ও সত্বরেই পীড়া উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হয়।

বাস্তবিক ভয় হইতেছে, থুতু ঘরের মধ্যে বা আলোক-বায়ুহীন কোন অন্ধকার স্থানে ফেলিলে। কারণ, এই সব স্থানে যক্ষ্মা-জীবাণুর সহজে মৃত্যু ঘটে না—৩০৯ দিন ত অনেক সময়েই বাঁচিয়া থাকে, সময়ে সময়ে আরও অধিক দিন বাঁচে।

যক্ষ্মা-জীবাণুর ধ্বংসের উপায়

১। অপ্রতিহত সূর্য্যালোকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যক্ষ্মা-জীবাণুর মৃত্যু ঘটে।

২। পরোক্ষ সূর্য্যালোকে জীবাণুর প্রাণ যাইতে কয়েক দিন মাত্র লাগে।

৩। গরম জলে ফুটাইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়—অর্দ্ধ ঘণ্টাই যথেষ্ট সময়।

৪। ২১২° ডিগ্রী ফারন্‌-হেট তাপের বাষ্প লাগাইলেও অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

৫। কার্ব্বলিক এসিড লোশনে (বিশ ভাগে এক ভাগ) মিশ্রিত করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রাণনাশ হয়।

৬। শতকরা দুই ভাগ লাইজল (Lysol) লোশনেও সত্বরে নাশ প্রাপ্ত হয়।

৭। আইজল (Izal) লোশনেও (পঞ্চাশ ভাগে এক ভাগ) ঐরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৮। সাইলিন (Cylin) লোশনেও ঐরূপ হয়। ১ গ্যালন জলে ১ আউন্স সাইলিন দিতে হয়।

৯। ফরমালিন (Formalin), ক্রিওলিন (Creolin) প্রভৃতিও ঐরূপ শোধনে ব্যবহৃত হয় (শতকরা ৫ ভাগ)।

১০। ক্লোরিনেটেড্ লাইমও (Chloriniated Lime)

দুই পারসেণ্ট সলিউশনে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা অপেক্ষাকৃত সস্তাও বটে।

এই সব লোশনের ভিতর যক্ষ্মা-জীবাণু যদি ২ ঘণ্টা থাকে, তবে উহার বিনাশ নিশ্চিত ও উহা দ্বারা ব্যাধি সংক্রমণের ক্ষমতা থাকে না।

এই সব বিষনাশক ঔষধ যদিও কার্য্যকরী, তথাপি থুতু প্রভৃতি ক্ষয়জাত জিনিষগুলিকে অগ্নি সংযোগে সৎকার করিতে পারিলেই উহার বিনাশ নিশ্চিত এবং সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

যক্ষ্মার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়

১। থুতু এবং যক্ষ্মাজনিত অন্যান্য সকল প্রকার নিঃসারণ যে-কোন পীড়িত স্থান হইতে বহির্গত হউক, বা ঐরূপে সংস্পর্শদুষ্ট অপর পদার্থ সকলই একটী উপযুক্ত পাত্রে জমা করিতে হইবে। পাত্রটি আবার এমন হওয়া চাই যে, উহা সহজেই পরিষ্কার করা যায় এবং গরম জলে সিদ্ধ করিয়া বা পচননিবারক ঔষধাদি দ্বারা শোধিত করা যায়; পোড়াইয়া লইতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।

২। কাশিবার সময়, হাঁচিবার কালে, কখনও বা হাসিবার সময়, এমন কি কথা বলিবার প্রসঙ্গেও অনেকের লালা ও থুতুর সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ নির্গত হয়। এই সব লালা ও থুতুর মধ্যে যক্ষ্মা-জীবাণু থাকার দরুন ইহা হইতে সহজেই সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। সুতরাং ঐ সব অবস্থায় মুখের সম্মুখে কাগজের বা কাপড়ের রুমাল দ্বারা আবরণ স্থাপন করা সঙ্গত।

ঐ সকল রুমাল সংগ্রহ করিয়া দিনে অন্ততঃ একবার পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

৩। দাঁত খড়িকা, ফলের বীচি, চুরুট ও সিগারেটের শেষাংশ এবং অন্যান্য সামগ্রী, যাহা পীড়িত ব্যক্তির মুখের সংস্পর্শে আইসে, সে সমুদায়ই ঐ থুতুর সহিত জমা করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে ধ্বংস করিতে হইবে।

৪। দাঁতন কুঁচিতেও (Tooth Brush) মুখ ধৌত করিবার পচননিবারক ঔষধ দিনে অন্ততঃ ২।৩ বার ব্যবহার করা সঙ্গত।

এই সকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র পাত্র থাকা আবশ্যক।

৫। হাত ও মুখ সাবান ও গরম জল দ্বারা বার বার ধৌত করা দরকার। হাতের নখ সর্ব্বদাই ছোট অবস্থায় রাখা দরকার ও যাহাতে পরিষ্কার থাকে, তাহা করা কর্ত্তব্য।

৬। পুরুষদের দাড়ী গোঁপ কামানই প্রশস্ত, অন্ততঃ পক্ষে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট রাখা দরকার, যাহাতে উহার ভিতর থুতু আটকাইয়া থাকিতে না পারে।

৭। যদি অন্ত্রের কোন স্থানে, অথবা প্রস্রাবের রাস্তার কোথাও এই ব্যাধির আক্রমণের সন্দেহ হয়, তবে বাহ্যে ও প্রস্রাব পাত্রে শোধিত করিয়া পরে অপর স্থানে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কমোড (Commode) ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ড্রেইন পায়খানায় বা ঐরূপ অন্য স্থানে যাঁহারা মল মূত্র ত্যাগ করেন, ত্যাগান্তে স্থানটী ভাল করিয়া ধৌত করিবার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের উচিত।

মুক্ত বায়ুর উপকারিতা

১। বদ্ধ বায়ুতে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা অধিক—মুক্ত বায়ুতে খুব কম।

২। মুক্ত বায়ুতে থাকিলে প্রকৃতির নানা পরিবর্ত্তনে শরীর অভ্যস্ত হয়। ঠাণ্ডা লাগিবার, সর্দ্দি, কাশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে এবং ব্যারাম প্রতিরোধ করিবার পক্ষে দেহের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহা বৃদ্ধি পায়।

৩। স্নায়ুমণ্ডলের শান্তিবিধান করে।

৪। ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং ওজনও বৃদ্ধি হয়।

৫। দেহের ও মনের অস্বস্তি ও খিট্‌খিটে ভাব দূর হয়—প্রাণে একটা আশার সঞ্চার হয়—একঘেয়ে জীবনে প্রাণের স্পন্দন দেখা যায়।

৬। দেহের বর্দ্ধিত উত্তাপ স্বাভাবিকে নামিয়া আইসে।

যক্ষ্মারোগীর কি কি বিষয় জানিতে পারিলে তাহার চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া যায়ঃ

১। প্রথমতঃ ব্যারাম কতদিনের এবং বর্ত্তমানে কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। শারীরিক শক্তি কতটুকু আছে।

২। রোগীর আর্থিক অবস্থা কিরূপ।

৩। সামাজিক অবস্থা, আচার ব্যবহার, অভ্যাস ও মেজাজ।

৪। বয়স।

এই সব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে পারিলে, চিকিৎসক তাহার অবস্থানুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহার কি করিতে হইবে।

১। স্যানাটোরিয়ামে যাইতে হইবে কি না?

২। গৃহে চিকিৎসা করিতে হইবে কি না?

৩। কোন স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠাইতে হইবে কি না?

৪। ডিস্‌পেন্সারীতে চিকিৎসা চলিবে কি না?

৫। অথবা হাঁসপাতালে আসিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে?

তাহাকে পরিবারবর্গ হইতে পৃথক্ থাকিতে হইবে কি না—কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে হইবে, অথবা আংশিকভাবে কাজ করা চলিবে, ইত্যাদি প্রশ্নেরও যথাযথ উত্তর দেওয়া চলিবে।

চিকিৎসায় আরোগ্য লাভের পর ক্ষয়রোগীর প্রতি উপদেশ

স্যানাটোরিয়াম হইতে, স্বাস্থ্যনিবাস হইতে বা রোগীর নিজ বাটীতেই আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসকের দায়িত্ব শেষ হয় না। রোগান্তে কি কাজ করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রাণরক্ষা উভয়ই ঘটিতে পারে, এই সমস্যাই অধিকাংশ রোগীর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে। কোথায় কি ভাবে কাজ করিলে জীবনোপায় হইতে পারে, রোগী ডাক্তারকে সর্ব্বপ্রথমে ইহাই জিজ্ঞাসা করে।

ডাক্তারেরা রোগীকে সাধারণতঃ উপদেশ দিয়া থাকেন যে, খুব খোলা স্থানে বাস করিবে। গ্রামে কাজ জোটাইতে পারিলেই ভাল হয়। আর যদি কোন পাহাড় বা স্বাস্থ্য-নিবাসে কাজ সংগ্রহ করিতে পার, তবে ত কথাই নাই। এই সব উপদেশ শ্রুতি-মধুর হইলেও, কার্য্যতঃ প্রায় ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জনের পক্ষেই ঘটিয়া উঠে না।

আমাদের দেশে গ্রামে যাইয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কি কাজ করিতে পারেন, দেখা যাক্। হাল-চাষাদি কাজ ত তাঁহারা অপমানজনকই মনে করেন। শুধু চাষ আবাদ দেখিবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক অতি অল্প লোকেই রাখে। ২।৪ গ্রামের মধ্যে একজন এরূপ আছে কি না, সন্দেহ। শাক-শব্জী বা ফলের বাগান করিতে পারে ; তাও নিজে যে করিবে, তাহা সম্ভব নয়। অথবা লোকজন

রাখিয়া করাইবার ক্ষমতা অধিকাংশেরই নাই—অর্থাভাবই তাহার প্রধান কারণ। তদুপরি অভিজ্ঞতা না থাকিলে এ সব কার্য্যও করা চলে না। আর এই সব হইতে যে সামান্য আয় হয়, তাহার দ্বারা জীবনধারণ করাই কষ্টকর। হয় ত এই সব লোক অধিকাংশই সহরের। তাহারা গ্রামে যাইয়া কোথায় বা জমী সংগ্রহ করিবে, আর কি করিয়াই বা এই সব নূতন কাজে পারদর্শিতা লাভ করিবে!

সুতরাং এই সব রোগী হঠাৎ এই সব নূতন বিষয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার ভাল হওয়া দূরে থাক, মন্দই অধিক ক্ষেত্রে হওয়ার আশঙ্কা এবং ব্যাধিরও পুনরাক্রমণের বিশেষ ভয়। সুতরাং এই সব দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার দায় যাহাতে সে এড়াইতে পারে, সেই দিকে সচেষ্ট হইতে হইবে। নূতন কাজ খুঁজিয়া লওয়ার চেয়ে যদি তাহার পূর্ব্ব কাজের স্থান খুব অস্বাস্থ্যকর না হয়, তবে তাহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত।

এই ব্যারামের ফলে যদি তাহার শারীরিক ক্ষমতার বিষয়ে ভালরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে, তবে তাহার পুরাতন কাজে যাওয়াই সুবিধা। এখানে হয় ত অল্পায়াসে কাজ চালাইতে পারিবে এবং অর্থের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইবে।

হাজার সাবধানে থাকিলেও এই ব্যাধির পুনরাক্রমণ হওয়া খুবই সম্ভবপর। যে সব রোগীর ব্যারামের সূত্রপাতেই বাধা দেওয়া যায় এবং মনে হয় যে, রোগ সর্ব্বতোভাবে সারিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকের পুনরাক্রমণ ও ব্যাধির ধ্বংসলীলা

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইলে চলিবে না। ক্রমাগত চেষ্টা চালাইতে হইবে এবং আশা করিতে হইবে যে, অনেকে যখন ভাল হয়, তখন আমিই বা হইব না কেন?

আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিতে পারিতেছি যে, যাহারা ব্যাধি হইতে আরোগ্য হইয়া নূতন কার্য্যের সন্ধানে স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা পুরাতন স্থানে যাইয়া নিয়মমত থাকিয়া কার্য্য করে, তাহাদের মধ্যে পুনরাক্রমণ কম; আসল কথা হইতেছে, রোগী কিরূপে জীবন যাপন করে? কাজে ত দিনের অতি অল্প সময়ই কাটে। চাকুরীর সময় ভিন্ন অপর সময় সে কি ভাবে কাটায়, তাহাই জানা বেশী দরকার। চাকুরীতে না হয় ৬ ঘণ্টা হইতে আট ঘণ্টাই থাকুক; কিন্তু তদ্ব্যতীত সময় যদি সে নিয়মমত বুদ্ধির সহিত তাহার লব্ধ উপদেশানুযায়ী কাটায়, তবে তাহার ভাল থাকিবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আর, যে ব্যক্তি অর্থশালী হইয়াও যদি আলস্যপরায়ণ হয়—নিয়ম না মানিয়া চলে, যে উপদেশ পাইয়াছিল, তাহার সদ্ব্যবহার না করে, তবে তাহার পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খুবই বেশী। সুতরাং এই সব যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসাও একটা নিশ্চিত পথ লক্ষ্য করিয়া অতি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে করা কর্ত্তব্য। রোগী যে কাজে ছিল, আরোগ্যান্তে তাহাকে সেই কাজের উপযোগী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই ডাক্তারদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আরোগ্য হওয়ার মুখেই তাহাকে যতদূর সম্ভব তাহার কার্য্যস্থানে যাইয়া,

যে সব অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে তাহাকে পড়িতে হইবে, তদনুরূপ করিয়া নিজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বাহিরে কার্য্যস্থলে যাইয়া যাহাতে আর বেগ না পাইতে হয়, তাহা করিয়া দিতে পারিলে তাহার আরোগ্য কতকটা পাকা রকমের হয় এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা খুব কম থাকে।

যক্ষ্মা-রোগীর গৃহ-চিকিৎসা

অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্য হইয়া রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত গৃহেই করিতে হয়। এই দরিদ্র দেশে শতকরা একজন দু'জনও ব্যয়-সাধ্য স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য-নিবাসের ব্যবস্থা করিতে পারে না। যাহারা কোনরূপে ব্যয়ভার বহন করিতে পারে, তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশই গৃহ ত্যাগ করিতে রাজী হয় না। আর যে সব লোক যাইতে পারে, তাহাদেরও কিছু দিন বাদে গৃহেই ফিরিতে হয়। স্যানাটোরিয়ামে যে সব নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া সে চলিয়াছে, বাটীতে আসিয়া যদি সেই সব নিয়ম প্রতিপালন না করে, তবে ব্যাধির পুনরাক্রমণ হওয়ার সমূহ আশঙ্কা। সুতরাং গৃহ-চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে এবং ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে হইবে। চারি শ্রেণীর লোকের পক্ষে এই গৃহ-চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রযোজ্য,—

১। যাহাদের ব্যাধি বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে।

২। যাহাদের কাজ ত্যাগ করিলেই আয় বন্ধ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা বাটীতে থাকিলে কিছু দিন খাওয়া পড়া ভাল মতে চলিতে পারে।

৩। যাহারা গৃহ ছাড়িয়া যাইতে একান্ত নারাজ এবং বাটীতেই চিকিৎসিত হইতে চায়।

৪। যাহারা একান্ত দরিদ্র।

গৃহ-চিকিৎসার দ্বারা উপকার লাভ নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটির উপর নির্ভর করে

১। ডাক্তার-প্রদত্ত উপদেশাবলী রোগীকে অতি বিশ্বস্ত-ভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।

২। উপযুক্ত খাদ্য ও উপযুক্ত বিশ্রাম করিবার মত অর্থ-সামর্থ্য থাকা চাই।

৩। গৃহের অবস্থা।

প্রথম বিষয়ে,—কতক রোগী আছে, যাহারা ডাক্তারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, তাহাদের লইয়া কোন মুস্কিল নাই। কতক আছে, যাহারা সহজে কথা শুনিতে চায় না, কিন্তু চেষ্টার দ্বারা তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারা যায়।

আর কতক আছে, যাহারা একান্ত মাথা-ভাঙ্গা—যাহারা কোন কথাবার্ত্তার ধার ধারে না। তাহাদের লইয়াই সমূহ বিপদ্‌। তাহাদের সম্বন্ধে একমাত্র উপায়—আইন দ্বারা তাহাদিগকে স্বতন্ত্রীকরণ (Compulsory Isolation)।

দ্বিতীয় বিষয়,— রোগীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ অনু-সন্ধান আবশ্যক। তাহার আত্মীয় স্বজন, তাহার কর্ম্মস্থলের কর্ত্তৃপক্ষ

বা কোন সমিতি বা অপর কাহার সাহায্য যদি না পাওয়া যায়, তবে গবর্ণমেণ্ট হইতেই হউক বা যে প্রকারেই হউক, ইহাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অথবা নিকটস্থ কোন হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

তৃতীয় বিষয় গৃহের কথা,—গ্রামে বা ছোট ছোট সহরে চিকিৎসার উপযোগী গৃহ পাওয়া কঠিন নহে—এখানে যথেষ্ট খোলা বাতাস ও সূর্য্যালোক পাওয়া যায় বা অতি সামান্য পরিবর্ত্তনেই ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু সহরে ইহার ব্যবস্থা তত সহজ নয়—এবং কি উপায় দ্বারা আলোক ও বাতাস পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে অনেক মাথা ঘামাইতে হয়। সহরে যে সব ঘরের বারান্দা আছে, তাহাতে সহজে থাকিবার ব্যবস্থা করা যায়। যদি বারান্দা না থাকে, তবে ছাদের উপর চালা বাঁধিয়া তাহার নীচে বাস করা যাইতে পারে। যদি উহার কোন সুবিধাই না থাকে, তবে যে ঘরে দরজা জানালা বেশ আছে, এমন ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘরের ভিতরে যাহাতে বায়ু চলাচল করিতে পারে, তাহার একান্ত প্রয়োজন। যদি গৃহে সেরূপ বন্দোবস্ত না থাকে, তবে যে বাটীতে উক্তরূপ বন্দোবস্ত আছে, এমন একটী বাটী ভাড়া করা আবশ্যক।

গৃহে কোন বাহুল্য জিনিষ থাকিবে না। আমাদের বাঙ্গালীর গৃহ প্রায়ই বাক্স ডেস্কদ্বারা ভরপুর থাকে—হাড়ী, ঠোলা—এমন কি, ধানের মরাই এবং ছত্রিশ কোটী জিনিষ ঐ একই ঘরে

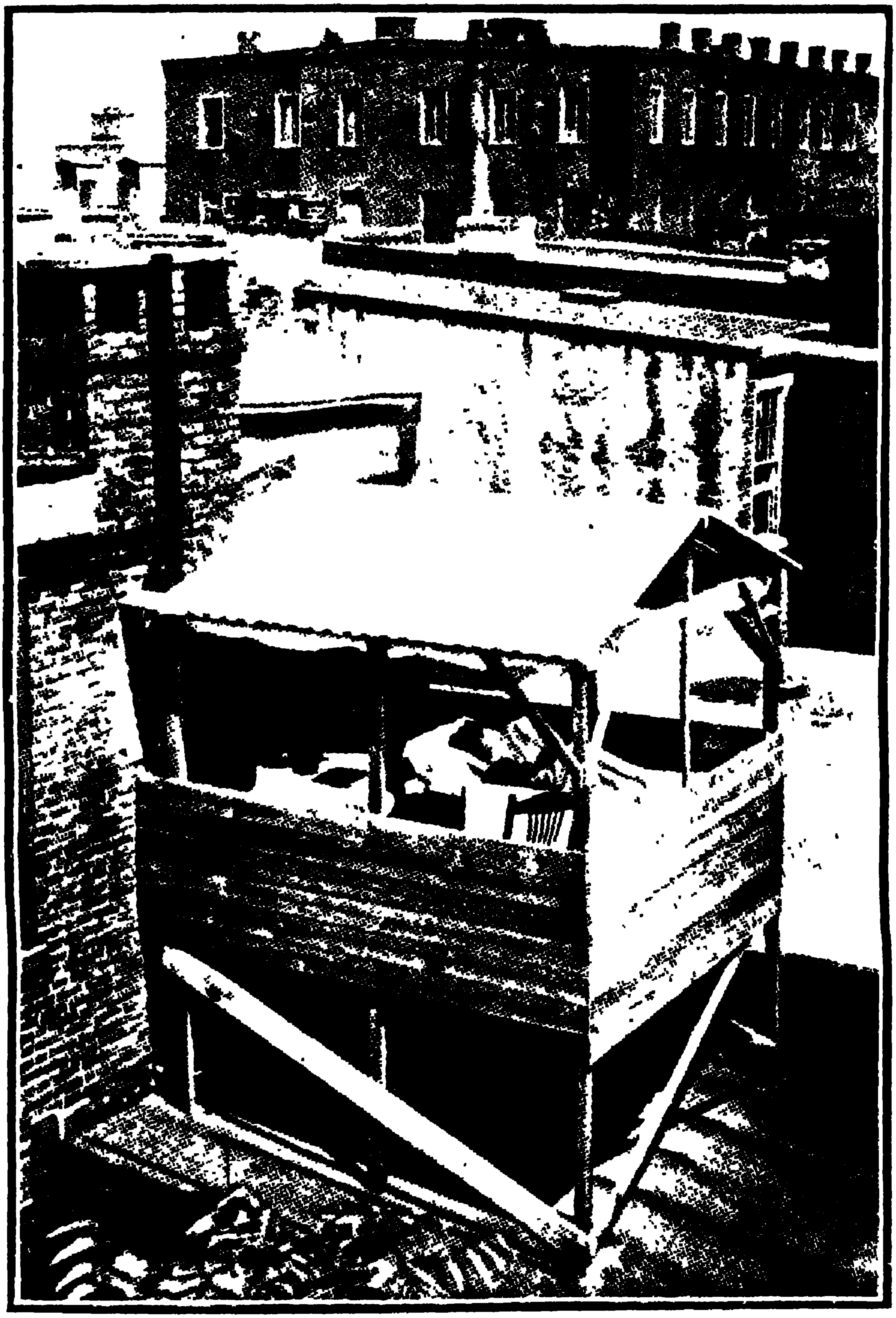

জনাকীর্ণ স্থানে যক্ষ্মা-রোগীর বাসোপযোগী গৃহ

থাকে। রোগীর ঘর হইতে তাহার আবশ্যকীয় জিনিষ ব্যতীত সমস্তই বাহির করিয়া দিতে হইবে।

ঘরে স্থান থাকিলে তবে ত বায়ু চলাচল করিতে পারিবে। আমাদের দেশে কিন্তু বাতাসের নামে অনেকের ঘাড়ে ভূত চাপে। তাহারা মনে করে, বাতাস লাগিলেই রোগ বৃদ্ধি হইবে—সর্দ্দি, কাশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি কতই না হইবে। কিন্তু তাহা ত নয়!

এই যে সর্দ্দি প্রভৃতি লাগে, সে সম্বন্ধে একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে দেখা যায় যে, উহা প্রায়শঃই দুই প্রকারে হয়,—(১) ঘরের উত্তপ্ত বায়ু হইতে বাহিরের শীতল বায়ুতে হঠাৎ গেলে এইরূপ হইবার আশঙ্কা, (২) সর্দ্দিজাতীয় ব্যাধি বড়ই সংক্রামক—একজনের হইলে প্রায়ই নিকটস্থ অপর ব্যক্তির হইয়া থাকে। কিন্তু শরীরে যদি রীতিমত ভাবে সমান বাতাস লাগে, সে যে প্রকারেই হউক, তাহাতে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় নাই। ইহাদের সহজে সর্দ্দি কাশি হইতে দেখা যায় না।

যক্ষ্মা চিকিৎসা স্যানাটোরিয়মেই হউক, আর স্বাস্থ্য-নিবাসেই হউক বা বাটীতেই হউক—ইহার প্রণালী সর্ব্বত্রই একই প্রকার। বাটীতে বরং খুটিনাটি বিষয়ে আরও বেশী দৃষ্টি দিতে হয়। এমন কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই যে, সেই নিয়মানুযায়ী চলিয়া গেলেই হইবে। আন্দাজে কিছুই হইবার নয়। এখানে যাহা কিছু জানিবার, সমস্তই ডাক্তারের নিকটে।

ডাক্তারের দায়িত্ব অনেক বেশী। কেবল যে চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দিলেই চলিবে, তাহা নহে, গৃহের স্বাস্থ্য কিরূপে ভাল থাকিতে পারে, রোগীর অবস্থানুযায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা—সামাজিক, পারিপার্শ্বিক নানারূপ ব্যবস্থা, সমস্তই ডাক্তারকে করিতে হইবে। রোগীকে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে, তাহার জীবন-যাপন-প্রণালী,—কিরূপে শুইতে হইবে, কোথায় থুতু ফেলিতে হইবে, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সর্ব্বদা উপদেশ দিতে হইবে। তাহা হইলে ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে এবং গৃহ-চিকিৎসায় একবার উপকার হইলে ঐ উপকার স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। যেহেতু আরোগ্য লাভের পর তাহাকে আর পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যে যাইয়া পড়িতে হইবে না।

যক্ষ্মা রোগ নিবারণে ছাত্রদের প্রতি ডাক্তার নফের (Knopfs') উপদেশাবলী (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত)।—

১। থুতু ফেলিবার পাত্র ভিন্ন থুতু ফেলিবে না। স্কুলে যদি কাপড়ের টুকরা বা রুমাল থুতু ফেলিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাক, তবে বাটী ফিরিয়াই উহা পোড়াইয়া ফেলিবে, অথবা ধৌত করিবার জন্য গরম জলে রাখিয়া দিবে।

২। শ্লেটে, ঘরের মেজে, খেলিবার জায়গায় বা বেড়াইবার পথে কখনও থুতু ফেলিও না।

৩। মুখের ভিতর অঙ্গুলী দিও না।

৪। নাক খুঁটিও না, অথবা হাতে, জামার হাতায়, গায়ের চাদরে বা ধূতির খুঁটে নাক মুছিও না।

৫। বই-এর পাতা উল্টাইতে মুখ হইতে আঙ্গুল দ্বারা থুতু লাগাইও না।

৬। মুখে কখনও পেন্সিল দিও না অথবা জিহ্বা বা ঠোঁট দ্বারা উহা ভিজাইও না।

৭। টাকা পয়সা প্রভৃতি কোনরূপ মুদ্রা মুখে দিও না।

৮। মুখের ভিতর পিন দিও না।

৯। আহার এবং পানীয় ব্যতীত অপর কোন দ্রব্যই মুখে দিবে না।

১০। কাহারও খাওয়া ফল, চিবান পান, ভোজ্য শেষ, বাঁশী, অপরের হুকা, খাওয়া বিড়ি সিগারেট বা যে-কোন বস্তু অপরে মুখে দিয়াছে, তাহা কখনও মুখে দিও না।

১১। ফল খাইতে হইলে সর্ব্বদাই ধুইয়া খাইবে কিংবা খোসা ছাড়াইয়া খাইবে।

১২। কাহারও মুখের উপর হাঁচিও না, বা কাশিও না। ঐরূপ করার সময় মুখ একদিকে ঘুরাইয়া লইবে, অথবা মুখের সম্মুখে রুমাল ধরিবে।

১৩। মুখ, হাত ও নখ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। প্রত্যেক-বার আহারের পূর্ব্বে হাত ও মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে।

১৪। যখন কোন কারণে শরীর খারাপ লাগে, বা কোন স্থান কাটিয়া যায়, বা অপরে কোন প্রকার আঘাত করে—শিক্ষক মহাশয়কে তাহা জানাইতে দ্বিধা করিও না।

১৫। স্কুলে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক, বাটীতেও সেইরূপ থাকিতে চেষ্টা করিবে।

১৬। দাঁত টুথ-ব্রাস ও জল দ্বারা বা অন্য যে-কোন উপায়ে খুব পরিষ্কার করিয়া মাজিবে। প্রতিবার খাওয়ার পরেই মুখ ভাল করিয়া ধোয়া উচিত। ঘুম হইতে উঠিবার পরে ও শয়ন করিতে যাওয়ার সময় ত পরিষ্কার করিতেই হইবে।

১৭। কাহারও মুখের উপর চুম্বন করিবে না—অপরকেও ঐরূপ করিতে দিবে না।

১৮। সর্ব্বদা মুক্ত বায়ুতে থাকিতে ভালবাসিবে এবং শ্বাস গভীরভাবে টানিতে অভ্যাস করিবে—ইহা যত বেশীক্ষণ পার, ততই ভাল।

সপ্তম অধ্যায়

শেষ কথা

যক্ষ্মা-রোগে তাপ, নাড়ীর গতি ও দেহের ওজন

তাপ ঃ—যক্ষ্মা-কাশিতে তাপ বৃদ্ধি হয়ই। জীবাণু যখনই সক্রিয় অবস্থায় থাকে—উহার প্রধান লক্ষণই তাপ উৎপাদন। শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিলেই মনে করিতে হইবে, জীবাণু সক্রিয় অবস্থায় আছে। তাপ যদি স্বাভাবিক থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, জীবাণু হয় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় আছে, নতুবা উহার বিনাশ ঘটিয়াছে। সুতরাং তাপের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাপ যত বেশী হইবে, জীবাণু ও জীবাণুজনিত বিষের ক্রিয়ার ততই আধিক্য বুঝিতে হইবে।

নাড়ীর গতি ঃ—যক্ষ্মা-কাশিতে প্রথম হইতেই নাড়ীর চাঞ্চল্য দেখা যায়। জ্বর যে পরিমাণ থাকে, তাহা অপেক্ষা নাড়ীর গতি বেশী থাকে। ভিতরে জীবাণু প্রকাশ থাকিলেই নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। বিষের প্রকোপ যত বেশী, নাড়ীর চাঞ্চল্যও ততই বেশী হইবে। নাড়ী সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে বুঝিতে হইবে, জীবাণু হয় প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে, নতুবা উহার ধ্বংস হইয়াছে।

ওজন ঃ—যক্ষ্মা-ব্যাধিতে আক্রমণ করিলে শরীরের ক্ষয় অনিবার্য্য। ক্ষয় হইলেই ওজন কমিতে থাকে। দেহের ক্ষয় হইতেছে কি না, তাহা ওজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই ধরা যায়। যদি ওজন না কমে বা বৃদ্ধির দিকে যায়, তবে বুঝিতে হইবে, ব্যাধির আক্রমণ রোধ হইয়াছে এবং রোগী ক্রমশঃ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

যক্ষ্মা-রোগীর শেষ অবস্থায় চিকিৎসা

যক্ষ্মার আক্রমণ যখন মৃদু, তখন উহার চিকিৎসা তত দুরূহ নহে। মোটামুটি সাধারণ চিকিৎসাতেই ফল পাওয়া যায়। সহজ আক্রমণে আলোক-বায়ুপূর্ণ স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে পারিলে ও পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিতে পারিলেই রোগ ভাল হইতে দেখা যায়। কিন্তু ব্যাধি যখন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে এবং লক্ষণাবলী কঠিন হইয়া পড়ে, তখন বিশেষ মনোযোগের আবশ্যক হয়। আর যখন একেবারে শেষের দিকে যায়, তখন অবস্থানুযায়ী চিকিৎসা করিতে হয়। তখন প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে যে, রোগীকে কিরূপে একটু স্বচ্ছন্দে রাখা যায়—তাহার কষ্ট কিরূপে লাঘব করিতে পারা যায়—বিষম যাতনার কিরূপে একটু উপশম হইতে পারে। এই সময়েই ডাক্তারদের বুদ্ধির দৌড় বুঝা যায়। যদিও সম্মুখে আশার কোন রেখাই দেখা না যাক্, তথাপি চিকিৎসা সমভাবেই চালাইতে হইবে। তাহাতে যে রোগের বিশেষ কোন উপশম হইবে, সে আশায় নয়—রোগী

মনে করিবে, আমার যত্নের বা চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইতেছে না। সুতরাং সে নিরাশায় ম্রিয়মাণ হইবে না ও সর্ব্বদাই হতাশের দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না।

এই সময়ে কঠোর নিয়মাবলীর কতকটা নড়চড় করা যাইতে পারে। রোগী যদি একটু বসিতে চায়, বসিতে দিবে—যাহাতে সে একটু আরাম বোধ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বিশুদ্ধ বাতাস বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে শরীরের অনেক স্বস্তি হয়। নানা উপসর্গের জন্য নানারূপ ঔষধ দিতে হয়। প্রথমে হয় ত নিদ্রার জন্য সহজ ব্যবস্থাই চলে। কিন্তু যখন অনিদ্রা-জনিত নানারূপ যাতনা হয়, তখন আফিং বা উহা হইতে উৎপন্ন কোন ঔষধ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই সময়ে চিকিৎসক তাঁহার সহানুভূতি দ্বারা, নানাবিধ উৎসাহ-বাক্য দ্বারা, এবং নানা-ভাবে আশার সঞ্চার করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারেন। রোগী দিনের পর দিন ভুগিয়া ভুগিয়া ক্রমেই জীর্ণ হইতেছে এবং মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। কত যে যাতনা, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় চিকিৎসকের উপস্থিত-বুদ্ধি, সহানুভূতি ও বিবিধ কার্য্যকরী শক্তি কত যে উপকারে আইসে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ডাক্তারের এমন ভাবে কাজ করিতে হইবে, রোগীর সমস্ত ব্যাপারে এমন ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, যেন সে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারে। ডাক্তারের উৎসাহবাক্যে রোগীর বিলুপ্ত আশা উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে এবং দীর্ঘ ভোগও আরামদায়ক হইয়া

উঠিবে। ডাক্তার ভবিষ্যতের, এমন কি, পরলোকের পর্য্যন্ত মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়া শেষের দিনগুলিকে ভয়শূন্য ও কতকটা শান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। তিনি প্রকৃত দরদী হইবেন।

যক্ষ্মারোগে সুলক্ষণাবলী

১। রোগ অতি প্রথম অবস্থায় ধরা পড়া।

২। বংশের মধ্যে ও বাটীতে কাহারও এই ব্যাধি না থাকা।

৩। রোগীর পূর্ব্ব সময়ে সবল ও সুস্থ অবস্থা।

৪। ভাল হজম করিবার ক্ষমতা।

৫। স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস।

৬। রোগ যদি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

৭। জ্বরের বেগ যদি খুব কম থাকে।

৮। ফুস্‌ফুসের অতি অল্প অংশ যদি আক্রান্ত হয়।

৯। সাধারণতঃ প্লুরিসি লইয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন ব্যাধি খুব ধীরে অগ্রসর হয়।

১০। রোগীর মানসিক বল যদি প্রচুর থাকে।

যক্ষ্মারোগে কুলক্ষণাবলী

এই ব্যাধিতে কোন্ রোগীর কোন্ ভাবে যে শেষ হইবে, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। কেন না, যাহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সময় সময় তাহাকেও আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রোগের এমন একটা সীমা আছে, যেখান হইতে আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। এই সব বিষয়ের কোন মীমাংসায় আসিতে হইলে তাপ, নাড়ীর গতি ও দেহের ওজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

তাপ ক্রমাগত খুব বেশী থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, দেহে বিষাক্ত জিনিসের ক্রিয়া ঘটিতেছে—হয় ত ফুস্‌ফুসে বৃহৎ ক্ষত হইয়াছে ও ব্যাধি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

নাড়ীর গতি যদি বিশ্রামে থাকিয়াও প্রতি মিনিটে ১০০"র উপরে থাকে বা সর্ব্বদাই যদি ১০১"এর উপরে থাকে, তবে জীবনের আশা অতি ক্ষীণ।

ওষ্ঠদ্বয় ও হাত পা যদি নীল হইয়া যায় বা পা যদি খুব ফুলিয়া যায়, অথবা উহার উপরে যদি কালসা (blood spots) দেখা দেয়, তবে মনে করিতে হইবে, শেষের আর অধিক বিলম্ব নাই।

শরীর অতিশয় ক্ষয়িত হইলে বুঝিতে হইবে, ব্যাধি খুব অগ্রসর হইয়াছে। ওজন যদি এক-তৃতীয়াংশের অধিক কমিয়া যায়, তবে জীবনের আশা অতীব ক্ষীণ।

ক্রমাগতই যদি গলা দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে—তবে উহাও খারাপ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যতই বেশীবার রক্ত-পাত হইবে, জীবনের আশা ততই কমিয়া আসিবে।

ক্ষয়রোগে সাধ্যাসাধ্য নির্দ্দেশ

(Prognosis)

১। আক্রমণ যদি অত্যন্ত মৃদু হয়, তবে নিজে জানিবার পূর্ব্বেই আপনা আপনি সারিয়া যায়।

২। আক্রমণ সামান্য—লক্ষণাবলীও সামান্য—সামান্য চিকিৎসায় বা সাধারণ বায়ু পরিবর্ত্তনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।

৩। রীতিমত লক্ষণাবলীর প্রকাশ পাইয়াও চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।

৪। বেশীভাবে আক্রমণ, এমন কি, ফুস্‌ফুসে গর্ত্ত পর্য্যন্ত হইলেও চিকিৎসার দরুন রোগ বহু দিবস যাপ্য হইয়া থাকে।

৫। খুব বেশী রকম আক্রমণ বা প্রথমে সেরূপ কিছুই নহে, কিন্তু চিকিৎসার কোন ফলই দেখা যায় না—এরূপ অবস্থায় মৃত্যু আসেই আসে।

যক্ষ্মাকাশে কি কি ভাবে মৃত্যু ঘটে

১। শরীরের বল ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া উহার একান্ত শীর্ণতা হয় ও অবশেষে মৃত্যু ঘটে। সাধারণতঃ অধিক কষ্ট না পাইয়া ও বেশ শান্তিতেই এ অবস্থার শেষ হয়। অধিকাংশ সময়েই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে।

২। শ্বাসরোধ হইয়া। যে সব যক্ষ্মা খুব দ্রুত বাড়িয়া যায় এবং অতি অল্প দিনেই মৃত্যু হয়—তাহাদের ক্রমেই শ্বাস-কষ্ট বাড়িতে থাকে এবং অবশেষে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

৩। ক্বচিৎ কদাচিৎ হার্টফেল হইয়া মৃত্যু ঘটে। এ ভাবে মৃত্যু খুব কমই ঘটিয়া থাকে। তবে শেষ অবস্থায় অতি দুর্ব্বল শরীরে যাহারা বেশী নড়াচড়া করে, তাহাদের হঠাৎ এই ভাবে মৃত্যু হয়।

৪। খুব রক্তমোক্ষণ হইয়া। ফুস্‌ফুসস্থিত কোন শিরা হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাইয়া অতিরিক্ত রক্তপাত হইতে পারে এবং তাহা বন্ধ করিতে না পারিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে।

৫। মস্তিষ্কে আক্রমণ হইয়া নানা কারণে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটিতে পারে এবং তাহার ফলে মোহ হইয়া মৃত্যু হয়। অধিক জ্বরের দরুন বা অন্যান্য কারণে মস্তিষ্ককে আক্রমণ করিলে এইরূপ হয়।

রোগী ও ডাক্তার

যদি পরস্পর সহযোগের কোন মূল্য থাকে, তবে উহা এই যক্ষ্মারোগে। ডাক্তারের বা স্বয়ং ধন্বন্তরীরও একাকী কিছু করিবার সাধ্য নাই। ডাক্তার যাহা বলিবেন, রোগীকে বেদবাক্যের ন্যায় তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। সহস্র অসুবিধা ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিধান প্রতিপালন করিতে হইবে—তবেই না এ রোগে সুফল পাইবার আশা!

ডাক্তারের মিনুমিনে হইলে চলিবে না। 'হ্যাঁ, এটাও হইতে পারে, ওটাও হইতে পারে, এটা না করিলেও চলে, ওটা করিলেও হয়'—এরূপ করিলে চলিবে না। এই ব্যাধির চিকিৎসায় ডাক্তারের মতের একান্ত দৃঢ়তা চাই। বলিতে হইবে যে, একমাত্র

ইহাই করিতে হইবে, অন্য কোনটিই নয়। ইহাতে রোগীকে মিছামিছি ভুলাইয়া কোন লাভই নাই, বরং সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। রোগী সঠিক অবস্থা বুঝিলে, তবে ত সহযোগ করিতে পারিবে? আপনার প্রাণ বাঁচাইতে কে না চাহে? রোগীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে—দেখ, যুদ্ধ যদি করিতে পার, তবে ভাল হইবার আশা সুনিশ্চিত—আর যদি তাহা না পার, মৃত্যু অনিবার্য্য। এমন ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য কে না কোমর বাঁধে? তখন যুদ্ধের সর্ব্ববিধ সাজ-সরঞ্জামের সহিত পরিচয় করাইতে হয়। অতি দৃঢ়ভাবে, এমন একটা বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে, রোগী যেন মনে করে, সুফল পাওয়া যাইবেই যাইবে। দো-মনা হইলে চলিবে না। 'হ্যাঁ, এটাও খাইতে পার, ওটাও খাইতে পার'—তা বলিলে চলিবে না। 'অমুক জিনিস খাইবে—তার পরিমাণ এই, অমুক সময় খাইতে হইবে'—সমস্ত সঠিক নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সমস্ত কার্য্যেই একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম চাই—এক চুল এ দিক্ ও দিক্ নয়। এই সকল রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তারের প্রভূত দায়িত্ব আছে। যাঁহার এই দায়িত্ববোধ নাই, তিনি যেন এ ভার কখনও গ্রহণ না করেন। সাহসের সহিত, দৃঢ়তার সহিত ও আশার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে—তবেই না জয় নিশ্চিত! শুধু ত রোগ চিকিৎসা নয়, রোগীর চিকিৎসাও প্রয়োজন। রোগীর সুখে দুঃখে সহানুভূতি—তাহার দুর্ব্বলতা ও নানাবিধ দোষ দূর করিতে সাহায্য করা—মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলিকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করা, এই সব কাজ করিতে ডাক্তারের সর্ব্বোচ্চ গুণ

থাকা চাই—স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি চাই—সহৃদয়তা চাই—নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের দৃঢ় সংকল্প চাই।

রোগী যদি ডাক্তারের উপদেশ মত কাজ না করে বা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করে, তবে সুফলের কোন আশা নাই। এই ব্যাধি অতি কঠিন, কিন্তু প্রতীকারসাধ্য। ডাক্তারের উপদেশমত সাবধানতার সহিত, দৃঢ়তার সহিত চলিলে আরোগ্য নিশ্চয়। যদি তাহা না পার, তবে অনর্থক ঔষধ কিনিয়া অর্থ নষ্ট করায় কোন লাভ নাই। ব্যাধির ক্রম অনুসারে ব্যবস্থার তারতম্য হয়। সকলের প্রতিই এক ব্যবস্থা প্রযুজ্য নহে। রোগীর ভালর জন্য যাহা নির্দ্দেশিত হয়, তাহা না করিলে অচিরেই বিষময় ফল ফলিবে। আশা করি, এমন অবোধ কেহ নাই, যিনি তাহা হইতে দিবেন। সকলেই আশান্বিত হউন, উপদেশ অনুসরণ করুন, যুদ্ধ জয় অবশ্যম্ভাবী।

যক্ষ্মা দূর করিবার উপায়

এই পুস্তকের বহু স্থানেই যক্ষ্মা কিরূপে দূর করা যাইতে পারে, তাহার সমস্ত খুটিনাটি লইয়া আলোচনা করিয়াছি। আর যে বিশেষ কোন নূতন কথা বলিবার আছে, তাহা মনে হয় না। অতি সংক্ষেপে সেই সব বিষয়ের পুনরালোচনা করিব।

সর্ব্বপ্রথমেই যক্ষ্মা-রোগীকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা আবশ্যক। তবে ত সাবধান হইতে পারা যাইবে? দূরেই থাকা হউক বা অপর যে কোন উপায়ই অবলম্বন করা যাউক,

ইহাদের খোঁজ না মিলিলে কোন কিছুই করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে ডাক্তারগণ ও জনসাধারণ মিউনিসিপ্যালিটির বা লোকাল-বোর্ডের স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীদের সংবাদ দানে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। রোগীর বাসস্থান নির্ণয় হইলে আবশ্যকমত যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থাই চলিতে পারে। এই সব রোগা মোটামুটী দুই শ্রেণীর থাকে—

(১) যাহাদের থুতু পরীক্ষা করিয়া যক্ষ্মা-জীবাণু পাওয়া যায় না (Closed cases)।

২। যাহাদের থুতুতে ক্ষয়-জীবাণু পাওয়া যায় (Open cases)। যাহাদের থুতুতে ক্ষয়-জীবাণু পাওয়া যায় না, তাহাদের দ্বারা রোগ সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা একান্তই কম; সুতরাং তাহাদের উপর দৃষ্টি মাত্র রাখিলেই চলে। তাহাদের নিজ বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা চলিতে পারে, প্রয়োজন হইলে বায়ু পরিবর্ত্তনে পাঠান যায় এবং কোন স্বাস্থ্য-নিবাসেও পাঠান যাইতে পারে। মাঝে মাঝে ইহাদের থুতু পরীক্ষার প্রয়োজন এবং যক্ষ্মা-জীবাণু পাওয়া গেল কি না, তাহা দেখা দরকার। যে সকল রোগীর থুতুতে জীবাণু পাওয়া যায়,তাহাদের দ্বারাই এই ব্যাধি চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় এবং তাহাদের সম্বন্ধেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাদের এই রোগ সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। গৃহের চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, আহারের সুবন্দোবস্ত, থুতু প্রভৃতি যেখানে-সেখানে না ফেলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পাত্রে

নিক্ষেপ করা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া—এক কথায় তাহার জীবন-প্রণালীকে সর্ব্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রোগ দূর করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মা প্রতিষেধের দুইটী দিক্ আছে—

১। ব্যক্তিগত দায়িত্ব

২। সমষ্টিগত দায়িত্ব

১। কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার জন্য রোগীকে নিজের সাবধান হইতে হয়। তাহার সাবধানতা ভিন্ন সেগুলি দূর হইবার উপায় নাই। যক্ষ্মারোগ সাধারণতঃ থুতু দ্বারা ব্যাপ্ত হয়—মল-মূত্রাদি অন্যান্য কারণেও যে হয় না, তাহা নহে। তবে সেগুলিকে কার্য্যতঃ উপেক্ষা করা চলে। সুতরাং থুতু সম্বন্ধেই বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কাশিবার সময় মুখ ঢাকিয়া রাখা প্রয়োজন। আবরণের জিনিস অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করাই ভাল। থুতু ফেলিবার একরূপ কাগজের বাক্স পাওয়া যায়—উহাতে ফেলিলে প্রতি বারেই পোড়ান যায়। নানারূপ পাত্রে পচন-নিবারক ঔষধ রাখিয়া উহার ভিতর থুতু ত্যাগ করা যায়। পরে উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায় বা ড্রেণে ফেলিয়া দেওয়া যায়। যাহাদের ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহাদের জন্য সঙ্গে রাখিবার উপযুক্ত বাসন আছে। আজকাল আফিসে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবার যে সমস্ত আধার রাখা হয়, যক্ষ্মারোগীদের তাহাতে থুতু নিক্ষেপ করা উচিত নহে। নিজ নির্দ্দিষ্ট পাত্র ভিন্ন অপর কোথাও থুতু ফেলা সঙ্গত নহে। কাপড়ের বা সিল্কের

রুমালে থুতু না ফেলা বা উহা দ্বারা মুখ না মোছাই ভাল—কারণ, উহা ভাল করিয়া না ধুইয়া ব্যবহার করিলে, পরে নিজের পক্ষেই হানিকর হইতে পারে। যদি একান্তই ব্যবহার করিতে হয়, তবে ব্যবহারান্তে, পচন-নিবারক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে জলে সিদ্ধ করিয়া তবে ধুইয়া লইবে। কোন স্থানে থুতু যদি আকস্মিক নিক্ষেপ করা হয়, তবে সে স্থান তৎক্ষণাৎ পচন-নিবারক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিবে। অনেকের থুতু গিলিবার অতি কদভ্যাস আছে, উহাতে পাকাশয় বা আমাশয়ের ব্যাধি হইতে পারে। যক্ষ্মা-রোগীর হাতের নখ ও দাড়ী গোঁফ ছোট করিয়া কাটা উচিত, নতুবা ঐ সব স্থান হইতে রোগ সংক্রমণ হইতে পারে। বার বার হাত ও মুখ ধোওয়া উচিত, বিশেষতঃ আহারাদির পূর্ব্বে। দাঁত মাজিবার ব্রাশ, খাওয়ার বাসন-পত্র, শুইবার খাট বিছানা প্রভৃতি স্বকীয় প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই পৃথক্ থাকা দরকার এবং সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে ধুইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখা উচিত। যক্ষ্মা-রোগী কাহাকেও চুম্বন করিবে না এবং শিশুদের নিজ মায়ের নিকটেও আসিতে দিবে না। যক্ষ্মাগ্রস্ত মাতা সন্তানকে বুকের দুধ দিবেন না। মলমূত্র ত্যাগের পর ঐ সব স্থান পচন-নিবারক ঔষধ দ্বারা শোধন করিবে। ঘর পরিষ্কার করিবার সময় ঝাঁটা দ্বারা ধূলি উৎক্ষিপ্ত করিবে না—কাপড় ভিজাইয়া ঘর মুছিবে। ধোপা-বাড়ী কাপড় দিবার পূর্ব্বে উহা জলে সিদ্ধ করিয়া, শুকাইয়া দিবে।

২। (ক) জনসাধারণের মধ্যে এই রোগের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার। নানা উপায়ে ইহা করা যাইতে পারে। যেমন প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপন লাগাইয়া (Placards), হাতে বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া (Hand bills), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা (Pamphlets) বিতরণ করিয়া, বড় বড় আফিসে, স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতালে, থিয়েটার, বায়স্কোপ, কলকারখানা, পৌরমণ্ডপ (Town Hall) হাট বাজার, মেলা, প্রদর্শনী, রেল, ষ্টীমার, কোর্ট, ধর্ম্মশালা, পান্থ-নিবাস প্রভৃতি স্থানে বিজ্ঞাপন দিয়া। রাজধানীতে কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপন করিয়া এবং তাহার তত্ত্বাবধানে দেশময় শাখা-সমিতির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই সব সমিতি যেখানেই রোগের সংবাদ পাইবেন, সেখানেই লোক পাঠাইয়া উপদেশ দিবেন—চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবেন এবং রোগী দরিদ্র হইলে শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিবেন এবং অর্থ সাহায্য করিবেন। ছায়াচিত্র ও চলচ্চিত্র দ্বারা দেশময় এই জ্ঞান বিতরণ করা যায়। ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ, আমোদের সহিত শিক্ষাও হয়। সমিতির সঙ্গে রোগীর শুশ্রূষা করিবার জন্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক নার্স থাকিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

(খ) যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসার সুবিধা করিয়া দিয়া। প্রত্যেক মহকুমায় ২।৩টী করিয়া যক্ষ্মা-চিকিৎসাগার (Tubercular Dispensary) থাকা উচিত। সাধারণ হাঁসপাতালসমূহে যে সব যক্ষ্মা-রোগী আসে, তাহাদের এই সব স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, বা নিকটস্থ সমিতিতে সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে।

প্রতি কেন্দ্রে বিনা পারিশ্রমিকে কফ পরীক্ষা করা যাইতে পারে এবং কাহার দ্বারা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং কাহার দ্বারা সম্ভাবনা নাই, তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বারা তত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই সত্য, তবু তাহাদের সর্ব্বতোভাবে সাবধান করিতে হইবে।

প্রথম শ্রেণীর (Open case) জন্যই বিশেষ সাবধানতা দরকার। ইহাদের অসাবধানতাতেই ক্ষয় ছড়াইয়া পড়ে। যদি রোগী চলিতে ফিরিতে পারে, তবে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে উপদেশ দিবে এবং কোন হাঁসপাতালে বা স্বাস্থ্য-নিবাসে (Sanatorium) রাখিতে চেষ্টা করিবে। রোগের ক্রম-ভেদে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠাইতে হয়। রোগের শেষ অবস্থা হইলে তদনুযায়ী স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠাইতে হইবে বা স্বতন্ত্র যক্ষ্মাগারে রাখিতে হইবে। এই স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation) একান্ত দরকারী। ইহার দ্বারাই যক্ষ্মার বিস্তৃতি বন্ধ করা যাইতে পারে। রোগীর বিছানা হইতে নড়িবার শক্তি না থাকিলে, সেখানেই তাহার পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যে সব অনিষ্টকারী রোগী (Open case) চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, তাহারাই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ করে—সুতরাং ইহাদের উপরেই শ্যেন-দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(গ) রোগ যে প্রধানতঃ থুতু দ্বারা বিস্তৃত হয়,—হাঁচিবার কাশিবার সময়ে থুতু সূক্ষ্মরূপে বাহির হইয়া যে অপরকে সংক্রমণ করে, থুতু যেখানে-সেখানে ফেলিলে যে উহা শুষ্ক হইয়া

ধূলির সহিত মিশিয়া শ্বাসের সহিত ঢুকিয়া ক্ষয় উৎপাদন করে—অথবা আহার্য্য সামগ্রীর সহিত বায়ুচালিত জীবাণু সংশ্লিষ্ট ধূলি মিশিয়া বা মাছি বা কীটপতঙ্গের দ্বারা নীত হইয়া যে একই-রূপ অনিষ্ট সাধন করে, তাহার উল্লেখ বহু স্থানেই করিয়াছি।

(ঘ) গোশালা, কসাইখানা প্রভৃতি স্বাস্থ্য-পরীক্ষক দ্বারা সর্ব্বদা পরিদর্শন। গরুর ক্ষয় থাকিলে, বিশেষতঃ বাঁটে যক্ষ্মা-জনিত ক্ষত থাকিলে, ঐ দুগ্ধ পানে ক্ষয় হইবার আশঙ্কা আছে। বিশেষভাবে ফুটাইয়া খাইলে আশঙ্কা খুব কম, কিন্তু ঐ রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ বর্জ্জনই প্রশস্ত। কসাইখানার, তথা সকল প্রকার মাংস সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

(ঙ) রোগীর অনুপাতে স্বাস্থ্য-নিবাস ও যক্ষ্মার জন্য পৃথক্ আরোগ্যশালা নির্ম্মাণ।

(চ) শিশুদিগকে যক্ষ্মা-রোগীদের নিকট হইতে দূরে রাখা বিশেষতঃ ঘরে হামাগুড়ি দিয়া ধূলি বালু মুখে না পুরিয়া দেয়, সে দিকে সতর্কতা। বাটীস্থ অন্যান্য সকলে যাহাতে থুতুর সংস্পর্শে না আইসে বা ক্ষয়রোগীর বিছানায় না বসে বা তাহার সহিত কোন প্রকারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না আইসে।

(ছ) গৃহে গৃহে যাহাতে যথেষ্ট আলোক ও বায়ু যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।

(জ) সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।

(ঝ) খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য উৎপাদন করিয়া এবং যাহাতে ভেজালহীন ও সস্তা খাবার পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া।

(ঞ) দেশের অর্থ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া, যাহাতে দারিদ্র্য দূর হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দরিদ্রের ব্যাধিও চিরনির্ব্বাসিত হইতে পারে।

যক্ষ্মা-রোগে কয়েকটী মনে রাখিবার কথা

জগতের মৃত্যু-সংখ্যার $\frac{১}{৭}$ ভাগ যক্ষ্মাব্যাধিজনিত।

যক্ষ্মা-রোগে ১৪ জনের মধ্যে ১৩ জনেরই ক্ষয়কাশিতে মৃত্যু হয়।

জগতের ১০ ভাগের ৯ ভাগ লোকই যক্ষ্মার কবলে পতিত হয়।

শব-ব্যবচ্ছেদে সহরের সমস্ত মৃত্যু-সংখ্যার শতকরা নব্বই জনের মধ্যেই যক্ষ্মা আক্রমণের চিহ্ন দেখা যায়।

বাংলার মৃত্যুর $\frac{১}{১০}$ ভাগ যক্ষ্মায় ঘটে।

কলিকাতায় শতকরা ৮ জনের মৃত্যু হয় যক্ষ্মায়।

কলিকাতায় ১১০০০ লোক যক্ষ্মায় ভুগিতেছে।

বাংলা দেশে গড়ে ১৫০০০০ দেড় লক্ষ লোক প্রতি বৎসর যক্ষ্মায় মরিতেছে এবং খুব কম পক্ষে ৮ হইতে ১০ লক্ষ লোক উহার আক্রমণে ভুগিতেছে।

ইহাতে দৈনিক প্রায় ৪০০ লোক মরিতেছে এবং প্রতি ৩ মিনিটে ১ জন মরিতেছে।

ক্ষয় সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়। তবে য়িহুদীদের মধ্যে ইহার আক্রমণ খুব কম ও নিগ্রোদের মধ্যে খুব বেশী।

সকল বয়সেই ব্যাধির আক্রমণ দেখা যায়। তবে ২০ হইতে ৩০ বৎসরই আক্রমণের প্রিয় সময়।

২৫টী পুরুষের স্থানে ৪০টী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়।

প্রতি হাজারে ৬ জন মুসলমান রমণী ও তিন জন হিন্দু নারীর মৃত্যু হয়।

বাংলা দেশে শিশুদের মধ্যে আক্রমণ কম দেখা যায়।

যে সব বাটীতে যক্ষ্মা প্রবেশ করে, তথায় শতকরা ৩৩টি বাটীতেই একাধিক আক্রমণ দেখা যায়।

শতকরা ৬০ হইতে ৮০ জনের গলা দিয়া রক্ত উঠে।

ব্রম্পটন হাঁসপাতালে ৪১২৫ জনের মধ্যে শতকরা ৬৯ জনের আধ আউন্সের বেশী রক্ত উঠে নাই।

যক্ষ্মার মধ্যম রকম আক্রমণেও ২৪ ঘণ্টায় ১½ হইতে ৪⅓ বিলিয়ন যক্ষ্মা-জীবাণু উৎক্ষিপ্ত হয়। আক্রমণ বেশী হইলে ৬ হইতে ৮ বিলিয়ন পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হয়।

একটি পিনের ছিদ্রপথে ১০০০ ক্ষয়-জীবাণু পাশাপাশি ভাবে যাইতে পারে।

যক্ষ্মারোগীর কেশ অধিকাংশ সময়েই তৈলাক্ত দেখা যায়, কিন্তু দেহ যখন অস্থিচর্ম্মসার হয়, তখন খস্‌খসেও হয়।

অনেক যক্ষ্মা-রোগীর অক্ষি-লোম খুব লম্বা লম্বা থাকে, চক্ষু

বিশেষভাবে উজ্জ্বল থাকে, ভ্রূদ্বয়ও খুব প্রশস্ত দেখা যায় এবং দেহেরও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি থাকে।

যক্ষ্মা-রোগীর ঘাম দিয়া সময় সময় রসুনের গন্ধ পাওয়া যায়। রোগী অধিক দিন যক্ষ্মায় ভুগিলে হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ডগা বর্ত্তুলাকার ধারণ করে এবং নখগুলি নিম্নমুখী হয়।

কোনরূপ উপসর্গ সৃষ্টি না করিয়া যক্ষ্মা বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে ; এমন কি, বিনা উপসর্গে ফুস্‌ফুসে বড় বড় গর্ত্ত (cavity) পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। আবার যক্ষ্মার অতি সামান্য আক্রমণেও ফুস্‌ফুসে যখন পর্য্যন্ত কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই, তখনও গুরুতর উপসর্গ সৃষ্টি করে।

কোনরূপ উপসর্গ দেখা দিবার অগ্রে অথবা ফুস্‌ফুসে ব্যাধির কোন সূচনা আবিষ্কারের পূর্ব্বেও থুতুতে ক্ষয়-জীবাণু দেখা গিয়াছে।

ফুস্‌ফুসে ক্ষত যত কম হয়, আরোগ্যের আশাও ততই বেশী। দুই দিকে আক্রমণের চেয়ে এক দিকের আক্রমণ সহজসাধ্য।

যদি বার বার পরীক্ষাতেও থুতুতে যক্ষ্মা-জীবাণু না পাওয়া যায়, তাহাতেও যক্ষ্মার আক্রমণ হয় নাই, এ কথা মনে করা যায় না। কিন্তু যদি একবারও জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যক্ষ্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না।

গর্ভিণীদের সহজে ক্ষয়ের আক্রমণ হইতে দেখা যায় না, কিন্তু যক্ষ্মা থাকাকালীন গর্ভাধান হইলে প্রায়ই দেহের উন্নতি দেখা যায়। পরন্তু প্রসবান্তেই ব্যাধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং প্রায়শঃই রোগিনীর মৃত্যু ঘটে।

যক্ষ্মা-রোগী প্রায়শঃই নিজের রোগ গোপন করে। আত্মীয় স্বজন এবং ডাক্তারও, রোগীর মনে আতঙ্ক হইবার আশঙ্কায়, তাহার নিকট হইতে ব্যাধির সংবাদ সাবধানে গোপন করেন।

রোগীর সহিত সহযোগ ভিন্ন এ ব্যাধির আরোগ্য অসম্ভব। কেবল যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসা করিলে চলিবে না, কিন্তু যে রোগী, তাহার চিকিৎসাও প্রয়োজন।

মৃত্যু যক্ষ্মা রোগে হয় না, কিন্তু যে যক্ষ্মাকে অবহেলা করা যায়, তাহাতেই ঘটে।

যক্ষ্মা প্রতিষেধসাধ্য, প্রতীকার-সাধ্য ও চিকিৎসা-সাধ্য। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'—এই মন্ত্রে ব্রতী হইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। জয় সুনিশ্চিত—আরোগ্য নিঃসন্দেহ।

গ্রন্থকারের অপর পুস্তক

প্রফেসারের পত্নী

সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত

১। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—"কোনান্ ডয়েলের গল্পের পরিচয় একেবারে অনাবশ্যক—তাঁহার খ্যাতি বিশ্ববিদিত। তাহা হইলে পরিচয় দিতে হইতেছে অনুবাদের। অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। উপেন্দ্র বাবুর এই প্রথম প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। অনুবাদ সরল ও সহজ হইয়াছে।"

২। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক ৺রামপ্রাণ গুপ্ত—"জলধর বাবু লিখিয়াছেন, অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে—আমারও সেই মত। যদি উপেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞাপনটি না থাকিত, তবে মৌলিক রচনা বলিয়াই মনে করিতাম।"

৩। সাহিত্যিক ও ধর্ম্মপ্রাণ ৺শশিভূষণ তালুকদার বি এল—"আপনার প্রকাশিত গল্পগুলি নৈতিক দোষ বর্জ্জিত এবং ভাষাও ইহার ভালই হইয়াছে।"

৪। প্রবাসী—"প্রসিদ্ধ ইংরেজ গল্পলেখক কোনান্ ডয়েলের চারিটি গল্পের অনুবাদ এই পুস্তকে আছে। লেখক ডাক্তার; সুতরাং ডাক্তারী গল্প তাঁহার মনোহরণ করিয়াছে;—তাহারই ফল এই অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। বইখানি অনুবাদ-সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিবে।"

৫। আনন্দবাজার-পত্রিকা—"অনুবাদ বেশ ভাল হইয়াছে, কোথাও মূল গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট হয় নাই। উল্লেখ না থাকিলে এগুলি

সেই মৌলিক প্রতিভারই প্রমাণ হইল। আশা করি, উপন্যাসপ্রিয় পাঠকেরা এইখানির সমাদর করিবেন।"

৩। ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড—"মনোরঞ্জক গ্রন্থ, উপন্যাস। বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া অনেক স্থলে ভাষার স্বাধীনতা দিয়াছেন। গ্রন্থের বিষয়, আমাদের প্রাচীন লেখক প্রবীণের মত এবং সঙ্গ কয়েকটির অনুবাদে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষার সরলতা ও মাধুর্য্য লেখকের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়াছে, অথচ স্বাভাবিকতা আড়ম্বর হয় নাই।"

৪। কায়স্থ পত্রিকা—'অশ্রু কুসুম' হইয়াছে বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীর যে সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়—যাহা হইতে এমন সহজ উপন্যাসে পরিণত হইয়া নূতন গ্রন্থকারকে আমরা শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আনন্দ পাইয়াছি।"

মূল্য এক টাকা

পুস্তকগুলির প্রাপ্তিস্থান—

১। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়,

২। শ্রীযুক্ত সুধাকুমার পাল

প্রোঃ—সাহিত্য ও আনন্দ মন্দির,

২০৩, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা,

৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

৬৫।১ মুদিপাড়া লেন, টালীগঞ্জ পোঃ, কলিকাতা।

৪। গ্রন্থকার—নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।